২য় সংস্করণ

ফিরে দেখা ১৯১২ এর কালোরাত্রে

টাইটানিক

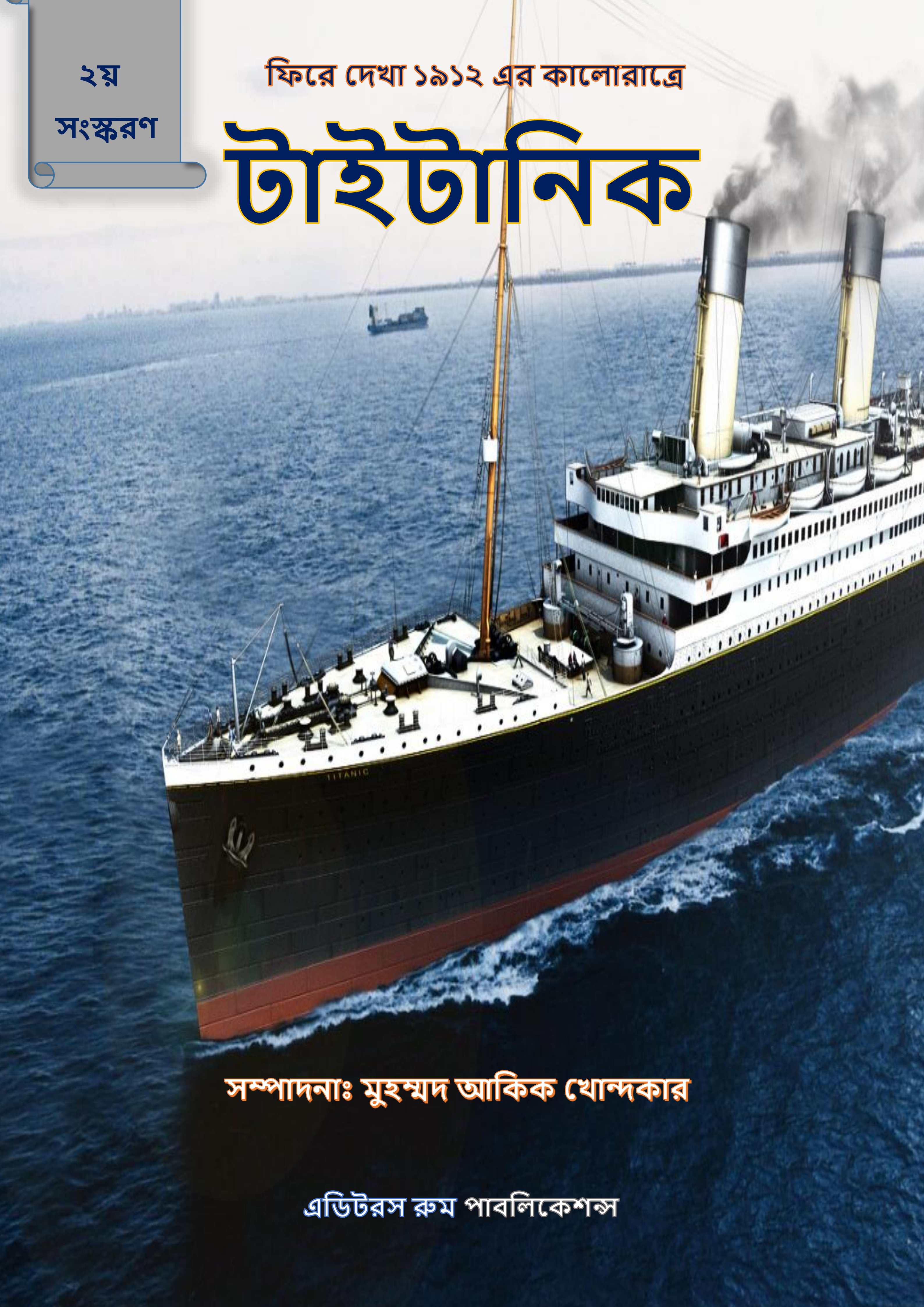

সম্পাদনাঃ মুহম্মদ আকিক খোন্দকার

এডিটরস রুম পাবলিকেশন্স

টাইটানিক(ফিরে দেখা ১৯১২ সালের কালোরাত্রে)

- সম্পাদনাঃ মুহম্মদ আকিক খোন্দকার
- প্রকাশকঃ আকিক টিউব পাবলিকেশন্স

- গ্রন্থস্বত্বঃ প্রকাশক

- প্রকাশকালঃ প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০২১
  দ্বিতীয় প্রকাশঃ জানুয়ারী,২০২৩
- প্রচ্ছদঃ মিমিয়া শিকদার, আমিনা আক্তার মিম
- বর্ণবিন্যাসঃ লেখক
- বইয়ের মোট শব্দসংখ্যাঃ ১০০৬৫টি

TITANIC(Go Back into the Blacknight of 1912)

- Edited by: Muhammad Akik Khondker
- Published by: Akik Tube Publications
- Publishing date: First Published December 2021
  Second Published January 2023
- Cover Designed by: Mimia Shikder, Amina Akter Mim
- Typing: Author
- Total Word Count Of This Book: 10065

@Muhammad Akik Khondker
©®Historical Book Fiction. Akik Tube Publishing Department©®

টাইটানিক

(এক ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর কথা)

সম্পাদনা

মুহম্মদ আকিক খোন্দকার

অবলম্বনে

- *উইকিপেডিয়া*
- *ব্রিটানিকা ইউ এস*
- *ন্যাশনাল জিও গ্রাফি তথ্যচিত্র*

এডিটরস রুম পাবলিকেশন্স লিমিটেড

আকিক টিউব পাবলিকেশন্স লিমিটেড

সূচিপত্রঃ

পৃষ্ঠা নম্বরঃ-

১। টাইটানিকের জন্ম ও সৃষ্টি ০৫-০৭
২। টাইটানিকের আকার আয়তন ০৮-১১
৩। টাইটানিকের চলাচলের রুট ১২
৪। কেন ডুবল টাইটানিক? কি ঘটেছিলো সেই রাতে? ১৩-২০
৫। টাইটানিক এক্সপেডিশন বা আবিষ্কার ২১-২৩
৬।টাইটানিক ডোবার পেছনের যুক্তি ২৪
৭। হিমশৈল কি? মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়ায় কেন এরা? ২৫-২৬
৮। টাইটানিক নিয়ে চলচিত্র ২৭-২৯
৯। জানা অজানার টাইটানিক ৩০
১০। এক নজরে টাইটানিক ৩১
১১। টাইটানিকে কারীগরী ভূল ৩২-৩৪
১২।জাহাজ দুর্ঘটনাঃ- ৩৫-৩৯

- এস এস নরোনিক ট্রাযেডি
- আর এম এস লুসতানিয়া ট্রাযেডি
- এস এস অ্যান্ড্রা ডোরিয়া ট্রাযেডি
- আর এম এস কারপাথিয়া ট্রাযেডি
- এমভি ডোনাপাজ ট্রাযেডি

১৩। টাইটানিক নিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলের প্রতিবেদন ৪০-৪১
১৪। টাইটানিক চলচিত্র ১৯৯৭ এর কথা ৪২-৪৩
১৫। টাইটানিকের অফিসারদের কথা ৪৪
১৬। টাইটানিকের আগাম ভবিষ্যৎবাণী ৪৫
১৭। আবার টাইটানিক!! আবার স্বপ্ন ৪৬
১৮। টাইটানিক এর আরো কিছু অজানা কথা ৪৭
১৯।টাইটানিক চলচিত্রের গান ৪৮
২০। টাইটানিক এর পিকচার স্টাডি ৪৯-৬২
২১। টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ এর আলোচনা ৬৩-৬৫
২২। টাইটানিক ও বর্তমান নৌ দুর্ঘটনা ৬৬-৬৭

শুরুর আগে কিছু কথা

উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে যে জাহাজটি নিয়ে শুরু হয়েছিলো এক না বলা কৌতূহলের ! উত্থান ঘটিয়েছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজের খেতাব নাম। তাকে নিয়ে পত্র পত্রিকায় শিরোনামের ছিলো না শেষ। ছিলো না শেষ একে দেখার অদম্য ইচ্ছার ও। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ছোয়ায় সেজেছিলো সে এক রঙ্গিন সাজে। পেয়েছিলো অডুবনীয় বা আনসিংকেবল খেতাবটি।নাম তার" **টাইটানিক**"।

সেই সময়ে লম্বায়, চওড়ায় , উচ্চতায় তার সমকক্ষ কোনো জাহাজই ছিলো না। এমনকি সাউদাম্পটনের সবচেয়ে উঁচু বাড়িটাও ছিলো টাইটানিক এর চেয়ে অনেক ছোট। ১৯০৭ সালে এর জন্ম শুরু হলেও সলীল সমাধী ঘটে ১৯১২ সালের ১৪ই এপ্রিল রাত ২টা ৪০ মিনিট মতান্তরে ১৫ই এপ্রিল মধ্যরাতের সময়। একই সাথে ১৫০০ মানুষের জীবনহানি ঘটে সেই কালরাত্রে।

বিংশ শতাব্দিতে এসেও উনবিংশ শতাব্দীর সেই রাতের কথা স্বরণ হলে আজও প্রতিটি মানুষের গায়ে কাটা দিয়ে উঠে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও ইঞ্জিনিয়ারগন দাবী করেছিলেন "**None or nothing could make it sink. It was definitely unsinkable**'". কিন্তু তাদের সেই অবিশ্বাস্য চ্যালেঞ্জকে মিথ্যা প্রমাণিত করে মহাসাগরে ভাসানোর ৫ দিনের মাথায় সমুদ্রপৃষ্ঠের ১২ হাজার ৬৪৪ ফুট নিচে ডুবে যায় টাইটানিক।

সেই রোমহর্ষক রাতের কথা মনের চোখে ভেসে উঠলে শীতল হয়ে যায় সমস্ত শরীর। মানুষের আত্ম চিৎকার , বেচে থাকার নিদারুন আকুতি, অবশেষে আটলান্টিকের হিমশীতল জলে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ। ডুবে যাওয়া টাইটানিকের যত চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে তা ১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া হলিউডের ছবি টাইটানিক এর কল্যানে। প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলারের ও বেশী খরচ করে তৈরি করা হয়েছিলো ছবিটি।

টাইটানিকের সকল কিছুই আজ ইতিহাস, রেকর্ড হয়ে আছে।টাইটানিক সম্পর্কে মজার মজার কিছু তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সার্বিকভাবে চেস্টা করা হয়েছে বইটিকে সমৃদ্ধ করতে।টাইটানিক নিয়ে বইটির সব তথ্য বিভিন্ন জায়গা হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই কিছু কিছু তথ্য ভূল হতেই পারে। আমি যদিও আপ্রান চেস্টা করেছি একটা নির্ভুল বই আপনাদের উপহার দিতে। বইটি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে কিনা সেটা সময়ই বলে দেবে। আপনাদের ভালোলাগার উপর নির্ভর করছে আমার সাফল্য।

লেখক
মুহম্মদ আকিক খোন্দকার

পর্বঃ০১

টাইটানিকের জন্ম সৃষ্টি

(Birth of Titanic)

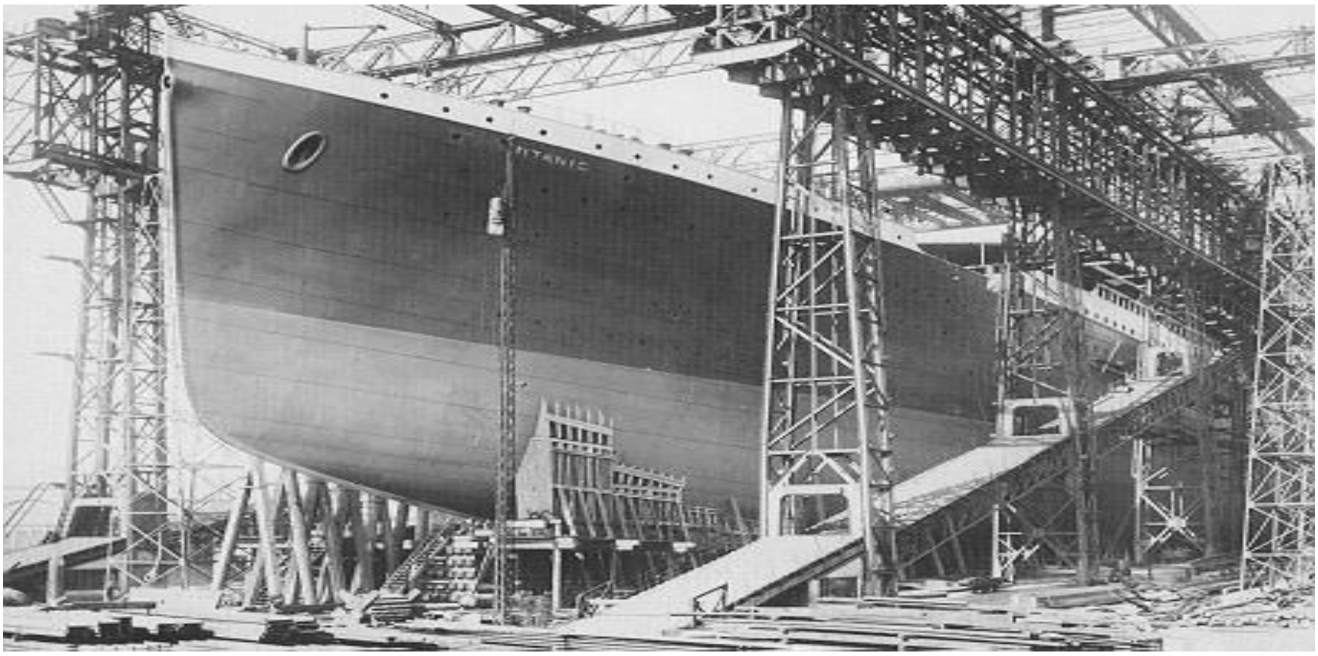

(টাইটানিকের সামনের অংশ)

সময় ১৯০৭ সাল। সাউদাম্পটন, ইংল্যান্ড ।
হোয়াইট স্টার লাইন এর প্রধান কার্যালয়।
চিন্তাভাবনা চলছে একটি অন্য ধাচের ,অন্য ডিজাইনের সমুদ্রযান বানাবার পরিকল্পনা।তখনকার সময়ে যে সকল জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করত তাতে অধিকাংশ জাহাজই ছিলো গভীর সমুদ্রে চলাচলের অযোগ্য। সেক্ষেত্রে স্বপ্নের রুট ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা যাবার বিপদসংকুল জায়গা ছিলো রীতিমতো জীবন বাজি রেখে চলাচল করার মতো ব্যাপার।

অনেক জাহাজ এই রুটে নিয়মিত সার্ভিস দিয়ে গেলেও নিরাপদ সমুদ্রযান বলতে কোনোটাই ছিলো না। তাই এই ভয়ানক রুটে যাত্রীদের আরামদায়ক ও নিরাপদ ভ্রমনের সেবা দেয়ার জন্য জন্ম হয় "**টাইটানিক**" নামের এক বিশালাকার প্রমোদতরনীর।

টাইটানিক এর নাম নেয়া হয় গ্রীক পুরানের দেবতা" **টাইটান**" এর নামে। টাইটান নামের আভিধানিক অর্থ হলো দৈত্যাকার, বিশালাকার। টাইটান ছিলো গ্রীক পুরানের অসাধারন শক্তিসম্পন্ন বিশালাকার দেবতা। আর উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে এই জাহাজ আকারে এতটাই বিশাল ছিলো যে কেবলমাত্র সেই অতিকায় টাইটানের সাথে তার তুলনা চলত।এটি সেই সময় মানুষের তৈরি সর্ববৃহৎ জাহাজ ছিলো যেটা আইফেল টাওয়ার কে লম্বায় ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

একাধারে ৬ বছর ধরে নির্মাণ শেষে টাইটানিককে পানিতে ভাসানোর সময় নির্মাণ সংস্থা " হোয়াইট স্টার লাইন" সংবাদপত্রের এক বিজ্ঞাপনে বলেছিলো যে " **The Biggest Ever Creation Of Man Is On The Move**" । আজকের যুগে কাজে কর্মে যেভাবে মানুষ ফাকি দেয় তখনকার মানুষরা কাজে কর্মে তেমন ফাকি দিতো না তাই কথাটি সত্য বলে সকলেই মেনে নিয়েছিলো।

(টাইটানিকের পেছনের অংশ)

তৈরি হওয়ার পর থেকেই প্রচুর আলোচিত হতে থাকে টাইটানিক।এবং তাকে নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ ছিলো না। যখন টাইটানিক প্রথমবারের মতো সাউদাম্পটন ছেড়ে যাবে তখন টাইটানিকের নিয়মিত যাত্রী ছাড়াও অন্তত ১০ হাজার লোক সাউদাম্পটন বন্দরে এসেছিলো এই বিশালাকার জাহাজকে এক নজর দেখে নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য ।

সেই সময়ে যে সকল কোম্পানী জাহাজ তৈরি করত তাদের মধ্যে " কুনারড লাইন " ছিলো প্রথম স্থানে। " লুসিতানিয়া ও মারুইতানিয়া " নামের গতিশীল দুটো জাহাজ বানিয়ে তারা গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো। হোয়াইট স্টার লাইন তাদেরকে টেক্কা দিয়ে পরপর ৩টি জাহাজ নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলো যার প্রথম চমক ছিলো " **টাইটানিক**" ।

পানিতে ভাসার পর দেখা গেলো যে " কুনারড লাইন " এর সবচেয়ে বড় জাহাজ মারুইতানিয়া টাইটানিক থেকে ১০০ ফিট ছোটো। ওজনের দিক দিয়েও টাইটানিক ১৫০০০ টন বেশী ভারী ছিলো।টাইটানিকের আরো একটি নাম ছিলো সেটা হচ্ছে " হোয়াইট স্টার মেল টিপল স্ক্র স্টিমার টাইটানিক" ।ট্রিপল স্ক্র স্টিমারের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট ছিলো এসব জাহাজের সোজা চলার ক্ষমতা বেশী। দ্রুত বাক নিতে পারে না এসকল জাহাজ। তাই বন্দর থেকে ছোট ছোট টাগের সাহায্যে বের করে সমুদ্রে যাওয়ার পর মূল গিয়ারে পাওয়ার দিতে হয়।

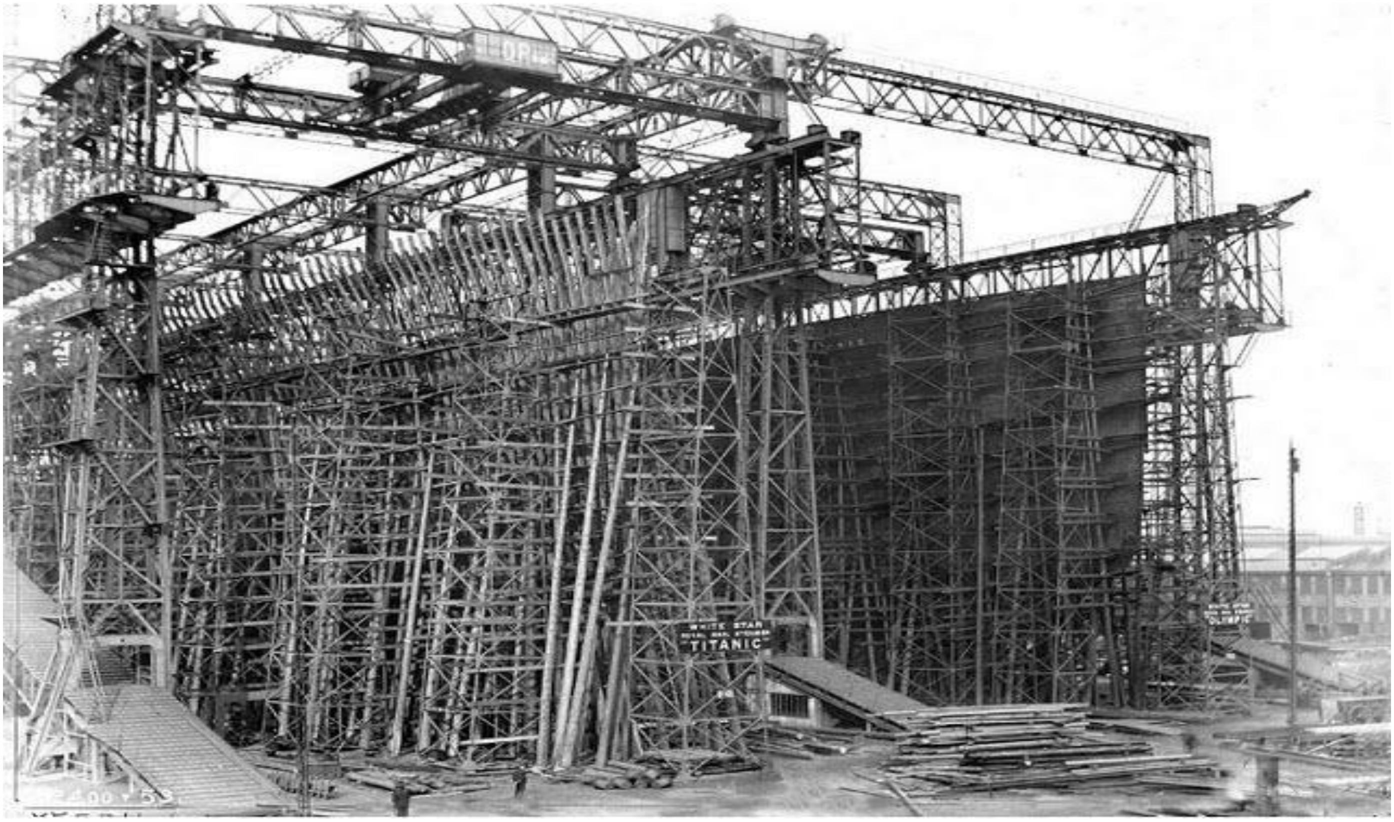

(টাইটানিকের খোল যখন তৈরি হচ্ছিলো)

৯ তলা টাইটানিক (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১১ তলার ও প্রমান পাওয়া যায়) জাহাজ এতটাই বিশাল ছিলো যে ১৪০০০ কর্মী একাধারে ৬ বছর ধরে নির্মাণ করেন জাহাজটিকে। টাইটানিক কে বলা হয়েছিলো " শিপ অফ ড্রিমস "। আর টাইটানিক ছিলো সত্যিই এক স্বপ্নের জাহাজ, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চলমান সমুদ্রযান আর অত্যাধুনিক কারীগরী সমারোহে তৈরি বিশাল এক প্রমোদতরনী। যেটা মানুষের কল্পনার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

পর্বঃ০২

টাইটানিকের আকার আয়তন

(Measurements Of Titanic)

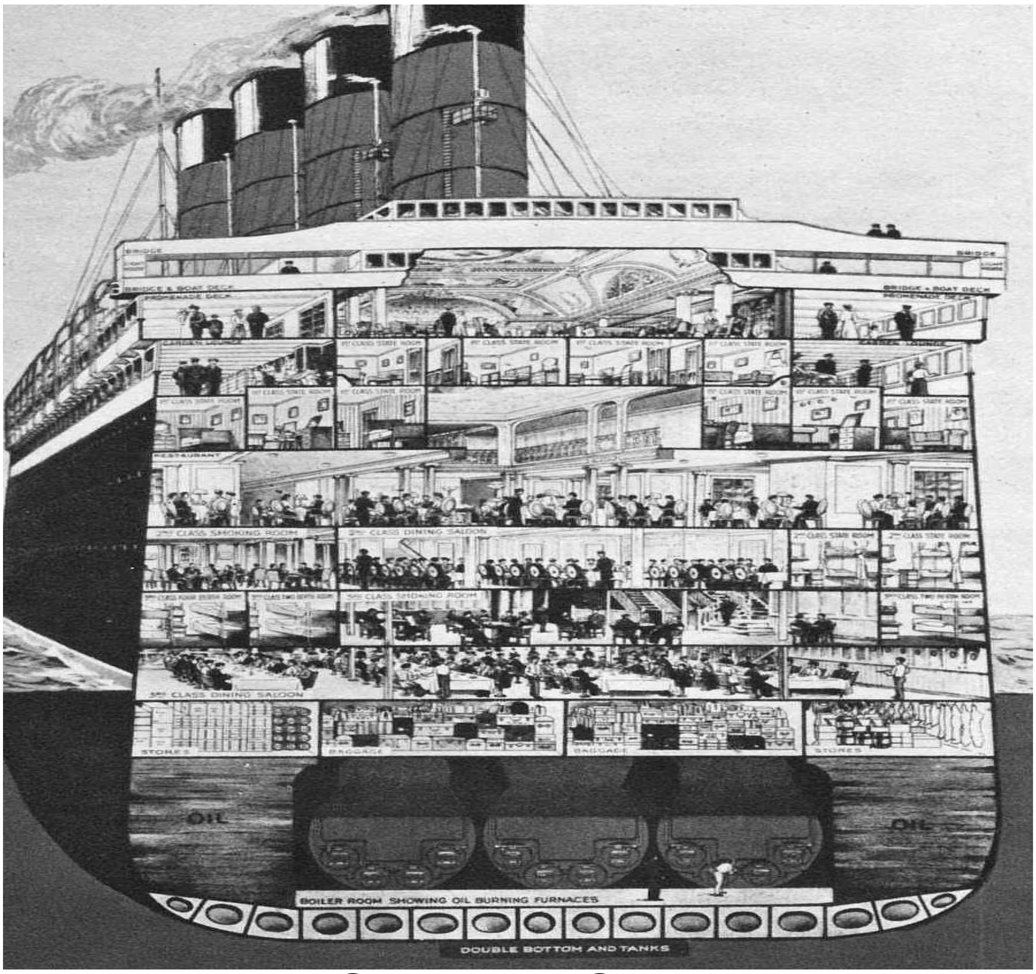

(টাইটানিকের ভেতরের ডিজাইন)

টাইটানিক জাহাজ লম্বাতে ছিলো ৮৮২ফিট ৯ ইঞ্চি (২৬৯ মিটার) এবং চওড়ায় ছিলো ৯২ ফিট ৬ ইঞ্চি(২৮ মিটার) ।স্ট্যাচু অব লিবার্টির তুলনায় অনেক বেশী লম্বা ছিলো এই সামুদ্রিক দানব টাইটানিক। টাইটানিক জাহাজের সম্পূর্ণ উচ্চতা ছিলো ১০৪ ফিট যার ৩৪ ফিট ৭ ইঞ্চি (১০.৫ মিটার) থাকত পানির নিচে।৪৬০০০ টনের মোট ওজনের জাহাজটির ওজন নেয়ার ক্ষমতা ছিলো ৪৬৩২৯ টন।টাইটানিকের খোল তৈরি করা হয়েছিলো অনেক স্টিলের পাত রিভেট দিয়ে জোড়া লাগিয়ে। স্টিলের প্লেটগুলো জোড়া লাগাতে ব্যাবহার করা হয়েছিলো ৩০ লক্ষের ও বেশী রিভেট। জাহাজের সমস্ত রিভেটের মিলিত ওজন ছিলো প্রায় ১৫০০ টন।

১৯১১ সালের মে মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায় টাইটানিকের আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজ। জাহাজ এর কারুকার্য ও ছোটোখাটো কিছু কাজ ছাড়া এটি পানিতে ভাসানোর উপযুক্ত হয়ে যায়। ১৯১১ সালের মে মাসের ৩১ তারিখে বেলফাস্টে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্ভোধন হয় টাইটানিক এর। বহু মানুষ জাহাজটির উদ্ভোধন অনুষ্ঠান দেখতে টিকিট কেটে বেলফাস্টের ডকে

উপস্থিত হন। পানির উপরে বিশালাকার জাহাজটির সৌন্দর্য দেখে উপস্থিত সকলের চোখ ধাধিয়ে যায়।

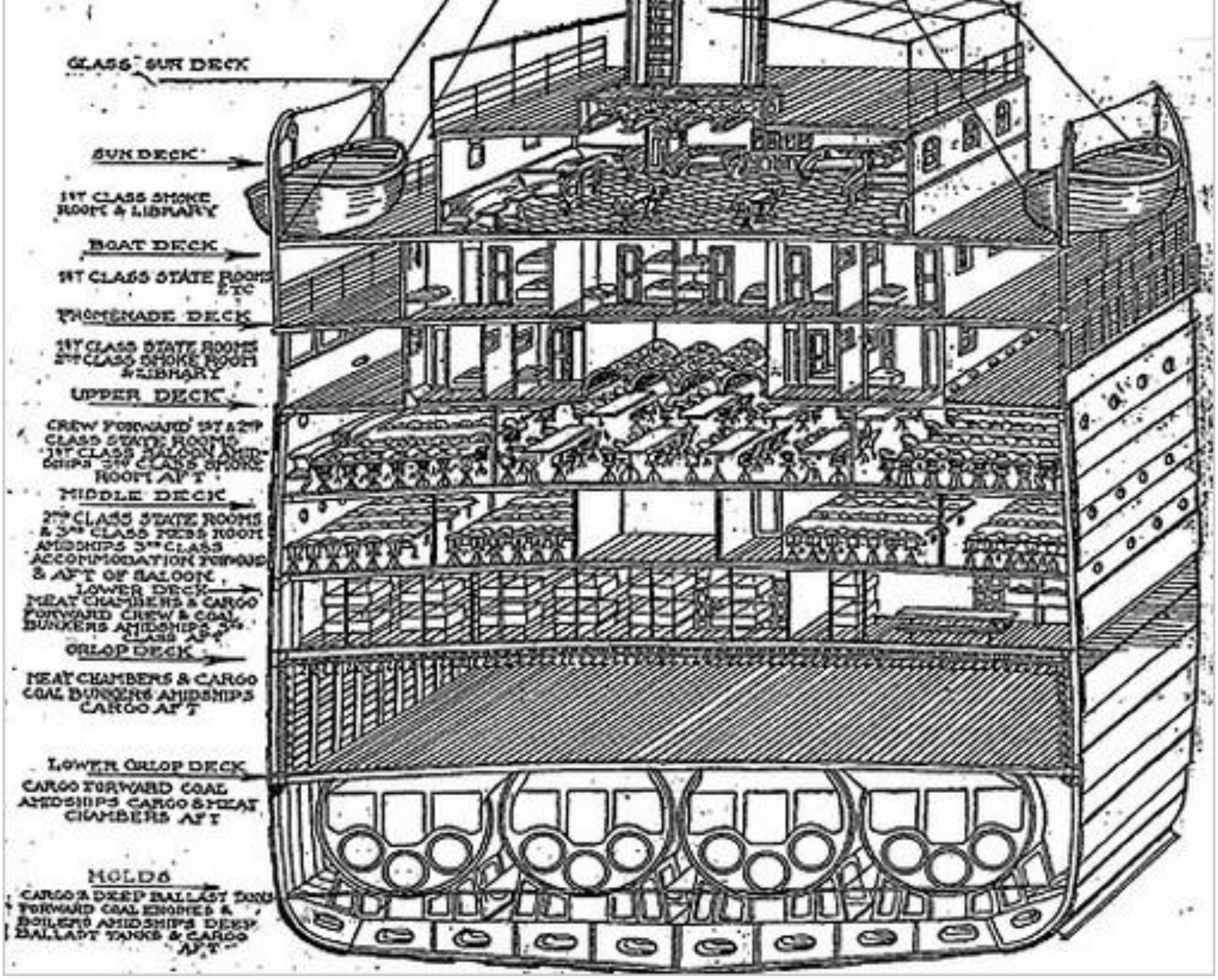

১৯১২ সালে টাইটানিকের সমস্ত কাজ শেষ হলে ১২০ জন কর্মী টাইটানিককে বেলফাস্ট থেকে সাউদাম্পটন বন্দরে নিয়ে আসেন।টাইটানিক জাহাজটি হারল্যান্ড অ্যান্ড উলফ এর মাস্টার শিপ বিল্ডার " **টমাস অ্যান্ড্রুস**" এর তত্ত্বাবধানে বেশ নিখুঁতভাবেই তৈরি হয়। টাইটানিকের প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের মধ্যে তিনিও ঘটনার দিন টাইটানিকেই ছিলেন।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই লোকটি বেশীরভাগ সময় নিজের কেবিনে বসে মানুষকে এবং সমুদ্রযাত্রাকে আরো উন্নত করে তোলার চিন্তায় বিমগ্ন থাকতেন।

টাইটানিক যে ডিজাইনে তৈরি হয়েছিলো তাতে ছিলো মোট ২৪টি বয়লার।আর রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন ছিলো দুটি যেগুলো এক একটি প্রায় চারতলা বাড়ির সমান উঁচু ছিলো। এছাড়া অতিরিক্ত ইঞ্জিন আর স্টিম টারবাইন জাহাজের গতিকে ২২ নটের বেশী তুলতে পারত।বিশাল টাইটানিককে এগিয়ে নিয়ে যেতে এর পেছনে ছিলো পিতলের তৈরি তিনটি বিশালাকার প্রপেলার ।গোটা জাহাজের তুলনায় প্রপেলার তিনটি আকারে ছোট হলেও

ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত প্রপেলারগুলো দ্রুতবেগে ঘুরতে পারত।জাহাজের পেছনের অংশে নিচে দুই পাশে দুটি এবং জাহাজ ও রাডারের মাঝে ছিলো একটি। ৭৮ ফিট ৮ ইঞ্চি উঁচু ও ১০১ টন ওজনের এই রাডারটি জাহাজের দিক পরিবর্তনে সহায়তা করত।

টাইটানিকে লাইফবোটের সংখ্যা ছিলো ১৬ টি।মানে এক সারিতে ৪ টা ৪টা ৮টা এবং অপর সারিতে ৮টা।এবং অতিরিক্ত লাইফবোট ছিলো ৪টা। সর্বমোট ২০টি লাইফবোট ছিলো জাহাজটিতে।লাইফবোটগুলোতে "লিভারপুল, সাউদাম্পটন" নামক কথাটি লেখা ছিলো। আর লাইফবোটগুলো যে হ্যাঙ্গার বা ডেভিট দিয়ে আটকে রাখা হতো সেটা হারল্যান্ড অ্যান্ড উলফ এর মাস্টার শিপবিল্ডার "**টমাস অ্যান্ড্রেউস**" এর পছন্দের ছিলো।তিনি টাইটানিকে" **ওয়েসিন কোয়াড্রান্ট ডেভিটস** " ব্যাবহার করেন।আসলে টাইটানিকে প্রথম সারিতে রাখা লাইফবোটের সাথে আরো এক সারি লাইফবোট রাখার ইচ্ছা তার আগে থেকেই ছিল কিন্তু হোয়াইট স্টার লাইনের কর্মকর্তারা দুই সারিতে লাইফবোট রাখতে আপত্তি জানান এই ভেবে ডেক এ জায়গা কমে যাবে তাই।

টাইটানিককে ভাসিয়ে রাখতে এর মধ্যে ১৬ টি বাতাসভর্তি পানিনিরোধী প্রকোষ্ঠ এর ব্যাবস্থা করা হয়েছিলো।এর মূল কারণ ছিলো জাহাজের বায়োন্সি বা প্লবতা যেনো নস্ট না হয়।এছাড়া টাইটানিকে আরো ১২টি জল প্রতিরোধক দরজার ব্যাবস্থা ছিলো ।কোনো কারণে জাহাজে সমুদ্রের পানি ঢুকে পড়লে দরজা গুলো আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যেতো ।

টাইটানিকের সুবিশাল হুইল হাউজ ছিলো এক মহান গুরুদায়িত্বের জায়গা। কারন এখান থেকে সমস্ত জাহাজের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করা হতো। টাইটানিকের হুইল হাউজের হুইলটি

তৈরি করেছিল " রোসব্যাঙ্ক আয়রন ওয়ার্কস " আর টাইটানিকের হুইল এর গায়ে লিখা ছিল "ব্রাউন প্যাটেন্ট টেলিমোটর" কথাটি।

তখনকার দিনে আধুনিকতম যন্ত্র ওয়্যারলেস –এর ব্যাবস্থা ছিলো টাইটানিকে। টাইটানিকের বেতার যন্ত্রটির সাহায্যে ২৫০ মেইল দুরত্বে খবর পাঠানো যেতো।জাহাজে ওয়্যারলেসে দায়িত্বে ছিলেন জ্যাক ফিলিপস ও হ্যারল্ড ব্রাইড। নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর পর টাইটানিক ডুবার কারন হিসেবে এই দুজনকেই বেশী দায়ী করা হয়।

টাইটানিকের ক্যাপ্টেন হিসেবে যিনি দায়িত্বরত ছিলেন তিনি ১৫ বছরের অভিজ্ঞ এই বিপদসংকুল এলাকায় জাহাজ চালনায়। তিনি " নিরাপদ ক্যাপ্টেন" "মিলিয়নিয়ার ক্যাপ্টেন" খেতাবপ্রাপ্ত ছিলেন। তার নাম ছিল " ক্যাপ্টেন জন অ্যাডওয়ার্ড স্মিথ"।টাইটানিক যাত্রার শেষে তিনি অবসর নেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। টাইটানিক এর ফাস্ট অফিসার ছিলেন উইলিয়াম মারডক, সেকেন্ড অফিসার ছিলেন চার্লস লাইটোলার, থার্ড অফিসার ছিলেন কুই পীট্ম্যান, ফোরথ অফিসার ছিলেন লিওনার্দো বক্সহল ,ফিফথ অফিসার ছিলেন বেঞ্জামিন লোয়ে, এবং সিক্সথ অফিসার হিসেবে টাইটানিকে দায়িত্বরত ছিলেন অ্যাডওয়ার্ড মুরডে।

পর্বঃ০৩

টাইটানিকের চলাচলের রুট

(Titanic's Voyageway)

টাইটানিকের মূল যাত্রাপথ ছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম রুট সাউদাম্পটন টু নিউইয়র্ক। সেই সময়ে প্রত্যেকটি জাহাজের নাবিকের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জের মতো ছিলো।

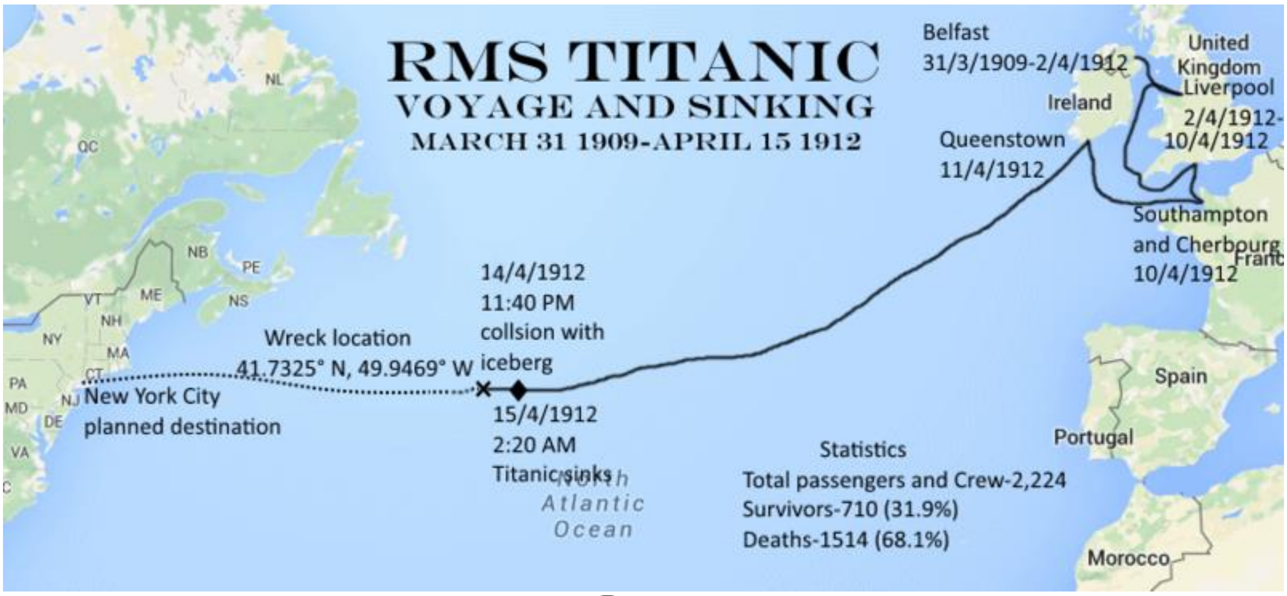

কারণ আটলান্টিক মহাসাগরের ভয়ানক শীতল জায়গা" নিউফাউন্ডল্যান্ড" যেখানে সম্পূর্ণ অঞ্চল বরফ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। ওখানে প্রত্যেকটি জাহাজের চলাচলের সময় নাবিকদের প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো। কারন তখনকার সময়ে বর্তমান যুগের মতো আইস প্যাট্রোল ছিলো না যে তারা আগে থেকে জানিয়ে দেবে জাহাজের চলার পথে কোনো বরফ আছে কিনা।

তো সেই রুটটিকেই টাইটানিকের একমাত্র রুট হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কারন সবাই জানত টাইটানিক আনসিংকেবল। গোলাবারুদ, মাইন ফাটালেও যার গায়ে চিড় ধরানো সম্ভব নয় তাকে আইসবার্গ বা বরফখন্ডো বা কি করবে?!!

এখানে বলে রাখা ভালো পানিতে ভাসমান বরফের ১০ ভাগের ১ ভাগ পানির উপরে থাকে আর বাকি ৯ ভাগ থাকে পানির নিচে। মানে এর বড় অংশই সবার চক্ষুর অন্তরালেই রয়ে যায়।

১৯১২-১৯১৭ সালের প্রদত্ত ম্যারিটাইম রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৩৪.৫% জাহাজের সলীল সমাধী এই নিউফাউন্ডল্যান্ড চ্যানেলেই ঘটেছে ।টাইটানিক জাহাজ ওই চ্যানেলে ঢোকবার পর থেকেই " মিসবাহ" নামের জাহাজ হতে সতর্কবার্তা আসতে থাকে।সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে পরিত্যাক্ত কাগজের বাক্সে ফেলে দেয়া হয়।

পর্বঃ০৪

কেন ডুবল টাইটানিক? কি ঘটেছিলো সেই রাতে?

(Why Titanic Sinked? What Happened To That Night)

১৯১২ সালের ১০ই এপ্রিল ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন বন্দর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের জন্যে ভেসেছিলো সেকালের স্পবচেয়ে বিলাসবহুল ও নিরাপদ যাত্রীবাহী জাহাজ টাইটানিক।দুই হাজার যাত্রীদের মধ্যে থেকেই অনেকেই সেদিন নিকট আত্মীয়দের থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন সূদূর আমেরিকার পথে। এই স্বপ্নে জাহাজ তাদের সকল দুঃখ কস্ট ভুলিয়ে দিয়েছিলো।এবং দেড় হাজার যাত্রী তাদের জীবনের শেষ ৪ টা দিন কাটিয়েছিলেন টাইটানিকে।যাত্রা শুরু করবার মুখে বড় এক বিপদের মুখ থেকে রক্ষা পায় টাইটানিক। শোনা যায় ডক থেকে বেরোবার পূর্বে "নিউ ইয়র্ক" নামের এক যাত্রীবাহী জাহাজের সাথে লাগতে লাগতে একটুর জন্যে এড়ানো সম্ভব হয়।এরপর টাইটানিক নির্বিঘ্নে আটলান্টিক মহাসাগরের জল চিরে ভেসে চলে।

কিন্তু মানুষের উচ্চাশার শেষ নেই। জাহাজে উপস্থিত হোয়াইট স্টার লাইনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর "জে ব্রুস ইসমে" টাইটানিকের গতিবেগ পরীক্ষা করার জন্যে সেটা আরো বাড়াবার জন্যে ব্যাস্ত হয়ে পড়েন। তার ধারনায় টাইটানিককে নিয়ে নিয়ে সংবাদপত্রে বিশাল আকারে লেখালেখি হয়েছে এবার তাদের গতির সম্পর্কে ও লিখতে দিতে হবে। তিনি ক্যাপ্টেন কে বোঝানোর চেস্টা করেন যে গতিবেগ বৃদ্ধি করলে টাইটানিক ১৭ ই এপ্রিল বুধবারের পরিবর্তে ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার রাতেই নিউইয়র্ক পৌঁছে যেতে পারবে কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই। ক্যাপ্টেনের উপর এর কোনো প্রতিক্রিয়া পড়েছিলো কিনা সেটা বলা শক্ত তবে কুইন্সটাউন থেকে টাইটানিকের শেষ দাড়ানোর পর তিনি বয়লার ফুল স্টীম করে দিয়ে বলেন" **Lets Strech Her Wings**" ।

চারদিন খুব সুন্দরভাবেই কেটে গেলো। পাচদিনের মাথায় অর্থাৎ চতুর্থ দিন রাত্রেবেলায় আটলান্টিকের সেই ভয়ঙ্কর এলাকায় ও কুয়াশাচ্ছন্ন এলাকায় প্রবেশ করে টাইটানিক। ওই অঞ্চলে প্রবেশ করার পরেও টাইটানিকের গতি কমানোর কোনো লক্ষন দেখা গেলো না।ম্যাক্সিমাম স্পিড বা সর্বোচ্চ গতিতেই চলতে লাগল সে।দুর্ঘটনার অন্তত সাত-আটঘন্টা আগে থেকেই অন্যান্যো জাহাজ হতে সতর্কতামূলক বার্তা আসতে থাকে টাইটানিকের মেইল বক্সে। সর্ব প্রথম “মেসবাহ” নামের এক জাহাজ হতে এরকম এক মেসেজ আসে-

“**TITANIC-340404. An Iceburg in your way. Slow down Your maximum speed and be Alert!!. Ice warning!! Ice Ahead.**”

কিন্তু দম্ভ হয়তো গ্রাস করেছিলো ক্যাপ্টেন স্মিথ কে।তিনি যে আনসিঙ্কেবল টাইটানিক এর ক্যাপ্টেন তাই হয়তো কোনোকিছুর তোয়াক্কা করেন নি।হিমশৈলভরা কুয়াশাছন্ন রাতের সমুদ্রে সর্বোচ্চ গতি ২৩ নটে জাহাজ চলতে থাকে।

আবার “দ্যা ক্যালিফোরনিয়ান” জাহাজ থেকে বরফখন্ডো নিয়ে আরো একটি মেসেজ আসে-

“**Ice Ahead -340404. Side mooring or Slow Down Your Current Speed. Be Alert!! Warning**”

এই বার্তাটিকে ও তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় নি।স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন আসতে পারে ক্যাপ্টেন স্মিথের মতো অভিজ্ঞ লোক তখন ও ঐ গতিতে জাহাজ চালানোর নির্দেশ দেবেন? আবার এটাও শোনা যায় ক্যাপ্টেনের কাছে নাকি সব বার্তা গুলো পাঠানো হয় নি।এবং হিমশৈলের

সতর্কবার্তার নোটটা কর্মরত রেডিও অফিসারের কাছ থেকে সোজা পরিত্যাক্ত কাগজের বাক্সে চলে যায়।
আসলে একটা বরফখন্ডো যে টাইটানিকের কোনো ক্ষতি করতে পারে এটা এখন চরম সত্যি হলেও অনেকের কাছেই ছিলো সেটা বিশ্বাস যোগ্যো ছিলো না। এরপর টাইটানিক ভেসে চলে আরো কিছুটা পথ। কিন্তু টাইটানিকের অফিসাররা বা যাত্রীরা কেউই জানতেন না যে আর কিছুটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। যেটা তাদের আমেরিকা যাবার স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরে চুরমার করে দেবে।

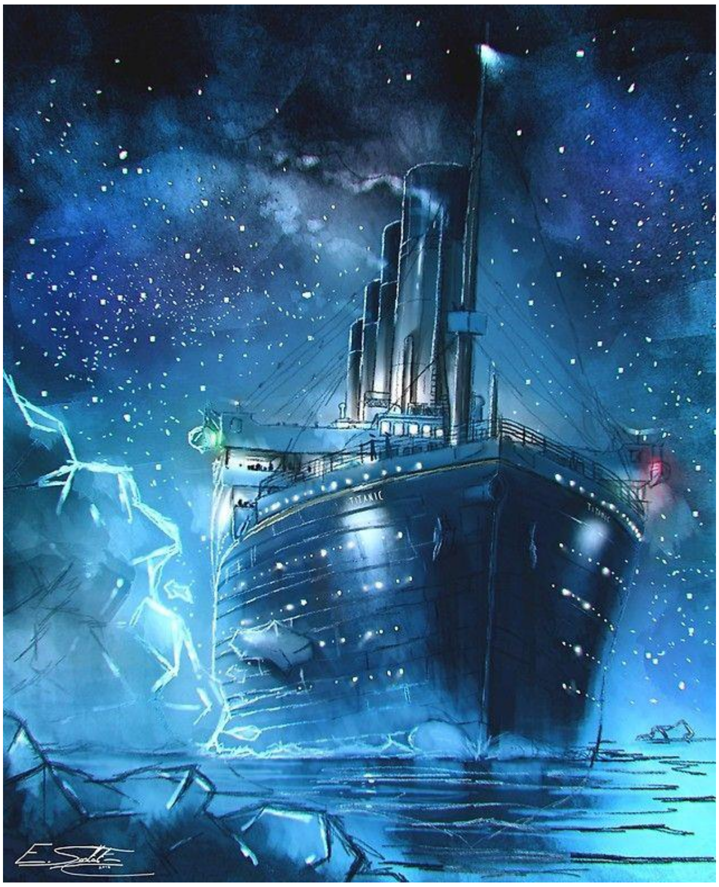

রাত ১১টা ৪০ মিনিট। আটলান্টিকের নিউফাউন্ডল্যান্ড অতিক্রম করছে টাইটানিক।কুয়াশায় ঢাকা চারিদিক।টাইটানিকের সামনে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে যেখানে দুজন পালাক্রমে চোখ রাখেন এবং দেখেন সামনে কোনো বিপদসঙ্কেত আছে কিনা!! তখন সেখানে ফ্রেডলিক ফ্লিট দায়িত্বরত ছিলেন। হঠাত ই তার চোখে কুয়াশা ফেড়ে বেড়িয়ে আসা এক বরখন্ডো চোখে পড়ে। যেটা টাইটানিকের থেকে প্রায় ৩০ সেকেন্ড এর মতো সামনে ছিলো। জাহাজের উপরের ডেকে ৬ জন কর্মরত কর্মীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বরফখন্ডো দেখতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ সতর্ক ঘন্টা বাজিয়ে হুইল হাউজ এ থাকা অফিসার মারডকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার এই সতর্ক বার্তার প্রতিউত্তরে তিনি" শুভকামনা" নামক শব্দটা শুনে নিজেও অবাক হয়ে যান।

এর পরের ৩৭ সেকেন্ডে তাদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা হয়ে যায়। ফ্রেডলিক ফ্লিট এবং তার

সহকর্মী লী দেখেন টাইটানিক কোনোরকম দিক পরিবর্তন না করে সোজা বরফের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর বরফসাদা মৃত্যু যেন হা করে আছে তাদের গ্রাস করবে বলে। এরই মধ্যে ব্রিজ্রুম থেকে বয়লাররুম আর ইঞ্জিনরুমে নির্দেশ করা হয় বন্ধ করার। বন্ধ করে দেয়া হয় বয়লাররুমের প্রত্যেকটি বয়লারের দরজা। থেমে যায় টাইটানিকের বিশালাকার প্রপেলার। কিন্তু জাহাজ কি আর ইঞ্জিন বন্ধ হলেই থামে? বিজ্ঞানের গতিজড়তায় আরো সামনে এগিয়ে যেতে থাকে টাইটানিক আর কমতে থাকে জাহাজ ও বরফের মধ্যের দুরত্ব।

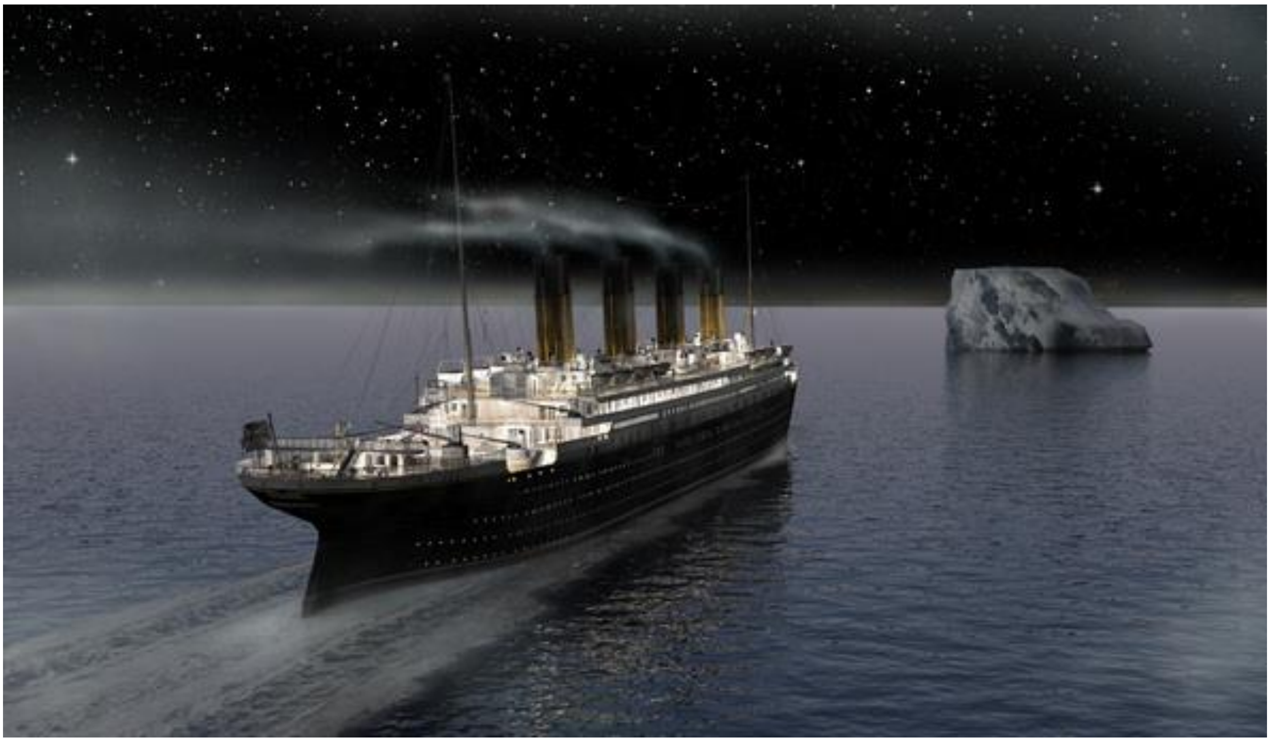

উইলিয়াম মারডক এর নির্দেশে জাহাজের হুইলকে পুরোপুরি বা দিকে কাটানো হয়। এবং ধীরে ধীরে বামদিকে ঘুরে যেতে থাকে টাইটানিক। ইঞ্জিনকে পেছনে হটানোর নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু জাহাজের গতি তো আগে কমাতে হবে।

টাইটানিকের উপরের ডেকে কর্মরত সকল অফিসারদের চলাচল কিছুক্ষনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে প্রত্যেকজনের। অপেক্ষা করছে কিছু একটার জন্যে। ফ্রেডলিক ফ্লিট চোখ বন্ধ করে আছেন যাতে খারাপ কিছু দেখতে না হয় তার। কিন্তু কমছে না টাইটানিকের গতির রেখা। ইঞ্জিনকে পেছনে হটানোর নির্দেশ দেয়া হলেও টাইটানিকের পেছনে যাওয়ার কোনো লক্ষনই নেই।পাগলা ঘোড়ার মতো এগিয়ে চলছে বরফখন্ডোটার দিকে।

এক......দুই......তিন এভাবে প্রমোদ গুনছেন মারডক। অন্যান্যো অফিসাররা চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন।দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে বরফখন্ডোটার বামপাশে ঘুরে যাচ্ছে টাইটানিক।হাত শক্ত করে ধরে রেখেছেন মারডক টাইটানিকের উড রেলিং এ। মনে হচ্ছে খুব অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সময় যেন আর পেরোচ্ছেই না। শেষ হচ্ছে না যেন অপেক্ষার প্রহর।

অবশেষে বরফখন্ডোটাকে ডান দিকে রেখে টাইটানিক এর মাথা বেড়িয়ে গেলেও শেষ মুহূর্তে প্রবলভাবে কেঁপে উঠে গোটা জাহাজ।টাইটনিকের নিচে পেটের অংশে বরফের ধাক্কায় খুলে যায় জাহাজের কামড়ার রিভেট। এবং হু হু করে পানি ঢুকতে থাকে আনসিঙ্কেবল টাইটানিকের খোলের মধ্যে ।

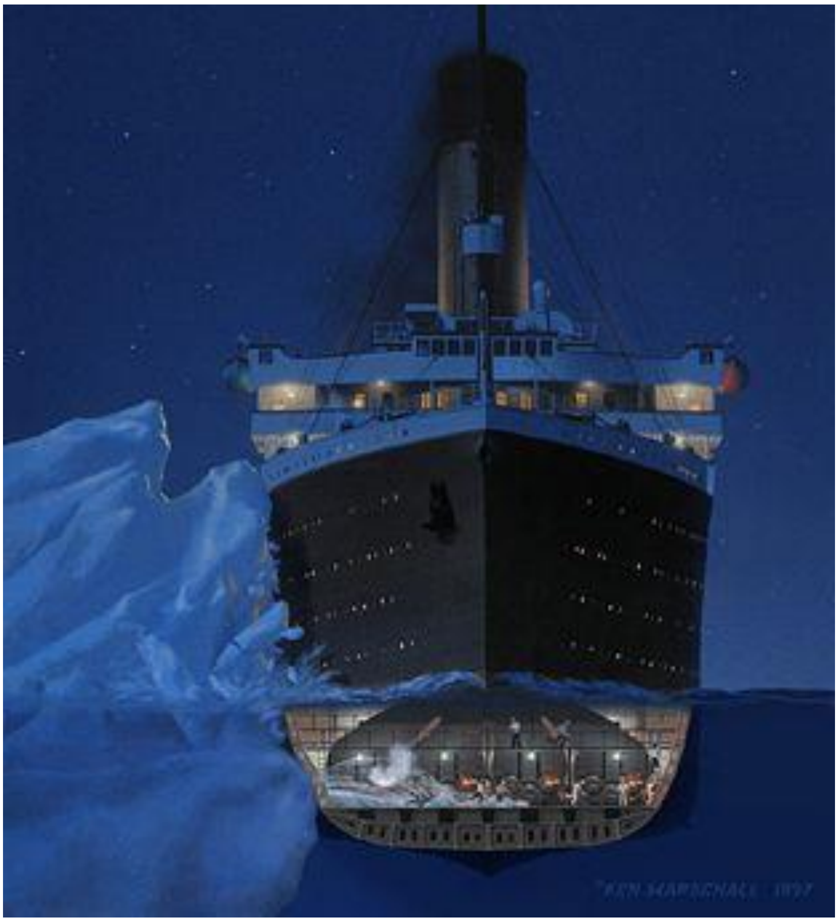

টাইটানিক এর ৩টি প্রপেলার এর মধ্যে মাঝেরটি ছিলো রাডার এর ঠিক আগে। বরফটি এড়াতে রাডারের সাহায্যে টাইটানিকের দিক পরিবর্তনের চেস্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু ইঞ্জিন উল্টোদিকে চালনা করার ফলে মাঝের প্রপেলারটির কারণে রাডারের কার্যক্ষমতা অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যায়। রাডারটি ঠিকভাবে কাজ করতে পারলে হয়তো টাইটানিককে আরো ১৪-১৫ ফিট আগে বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে দুর্ঘটনা এড়ানো যেতে পারতো।

ক্যাপ্টেন স্মিথ তার কেবিন থেকে বেড়িয়ে এসে মারডককে জিজ্ঞাসা করেন " **Mr Murdoch !! What was That ?!!**" মারডক জানান- " **An Iceburg Sir.I Try my Best To stop Titanic.But all engines are full powered."**। ক্যাপ্টেন সাথে সাথে এমারজেন্সি গেটগুলো বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দেন যাতে সাগরের পানি জাহাজে উঠতে না পারে। যে চারটি প্রকোষ্ঠ ছিলো বিপদমাত্রায় তা ছাড়িয়ে ছয়টি প্রকোষ্ঠে সাগরের পানি ঢুকে পড়ে। ক্যাপ্টেন ও জাহাজকর্মীরা যখন উপর থেকে জাহাজের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা পরীক্ষা করছেন ততক্ষনে টাইটানিকের তলদেশের খোলে সাগরের শীতল ও ভারী পানি অবিরামভাবে ঢুকে পড়ছে।

ছয়টির ও বেশী প্রকোষ্ঠে সাগরের পানি ঢুকে পড়ায় জাহাজের সামনের দিকটা ক্রমেই ভারী হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে টাইটানিকের ফক্সেল।ক্যাপ্টেন স্মিথ ও ট্মাস অ্যান্ড্রেউস যখন বোঝেন টাইটানিক এবার ডোবার অপেক্ষায় তখন যাত্রিদের বাচানোর আপ্রান চেষ্টা করা হয়। অথচ টাইটানিকের চরম পরিনতির কথা তাদের কাছে গোপন রাখা হয় যাতে আতঙ্ক তাদের গ্রাস না করে।

কিন্তু এরই মধ্যে দেখা যায় আরেক বিপদ। বয়লার রুমে উত্তপ্ত বয়লারের সংস্পর্শে সাগরের ঠান্ডা পানি এসে পড়ায় ঘটে যায় বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ। যার ফলে বয়লার রুমের দেয়াল ভেঙ্গে সাগরের পানি প্রবলবেগে জাহাজের মধ্যে ঢুকে পড়তে থাকে।

টাইটানিক কে তার প্রথম যাত্রায় তো দুরের কথা কোনোদিনও যে এই পরিস্থিতির সম্মুক্ষিন হতে হবে তা নির্মাতা সংস্থা ভাবেনি কোনোদিন।আর ভাবেনি বলেই টাইটানিকে মাত্র ১৬ টি লাইফবোট রাখা হয়েছিলো। এই অল্প লাইফবোটে মাত্র ১১৭৮ জনের জায়গা হতে পারত। কিন্তু ১০০০ জনও জায়গা পান নি লাইফবোটে। এর কারণ প্রথম দিকে বেশ কিছু বোট পুরো ভর্তি না করেই ভাসানো হয়েছিলো পানিতে।

ব্রিটেনের পাবলিক রেকর্ডস অফিসের নথিপত্র ঘেটে জানা যায় যে লাইফবোটের সাহায্যে প্রথম শ্রেণীর ৯৭ শতাংশ মহিলা ৩৪ শতাংশ পুরুষ , দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮৪ শতাংশ মহিলা ৮ শতাংশ পুরুষ , তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ৫৫ শতাংশ মহিলা ও ১২ শতাংশ পুরুষ নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

টাইটানিক এর ডেকটি ছিলো সাগরের পানি থেকে অনেক উঁচুতে। তাই লাইফবোটগুলোকে ডেভিট এর সাহায্যে প্রায় ৬২ ফিট নিচে নামাতে হয়েছিলো। পানিতে নামানোর সময় মানুষভর্তি বোটগুলোর ভারে সেগুলো প্রায় এক ফুট করে বেকে যায়। এই দৃশ্য দেখে যাত্রীদের অনেকেই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন।

টাইটানিকের প্রথম অফিসার উইলিয়াম মারডোক যাত্রীদের লাইফবোটে উঠতে অবিরামভাবে সাহায্যে থাকেন।জলমগ্ন যাত্রীদের উদ্দ্যেশ্যে ডেকচেয়ারগুলো ছুড়ে ছুড়ে দেন যাতে সেগূলো আকড়ে ধরে তারা আত্মরক্ষা করতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে ক্যাপ্টেন স্মিথ কে বারবার বলা সত্বেও তিনি লাইফবোটে উঠতে রাজি হননি। টাইটানিকের করুন ও অন্তিম পরিনতিতে তিনি সলীল সমাধী বেছে নেন।জাহাজের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি শেষ যে কথাগুলো বলেন-

“ Well Boys, Do Your Best For The Women And Children And Lookout For Yourselfs”

টাইটানিকের ক্যাপ্টেনের সাথে ডিজাইনার টমাস অ্যান্ড্রেউস জাহাজের সাথে স্বেচ্ছায় সলীল সমাধী বেছে নেন। কিন্তু টাইটানিকের মালিক হোয়াইট স্টার লাইনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে ব্রুস ইসমে জীবনের ঝুঁকিই নেন নি। মহিলা ও শিশুভর্তি লাইফবোটে তিনি জোর করেই উঠে পড়েছিলেন। দায়িত্বপালনরত অফিসার ও জাহাজ কর্মীদের পাশে না দাঁড়িয়ে এইভাবে নিজের প্রাণ বাচিয়ে ফেরা ইসমের উপর অনেকেই কাপুরুষতার অভিযোগ এনেছিলো।

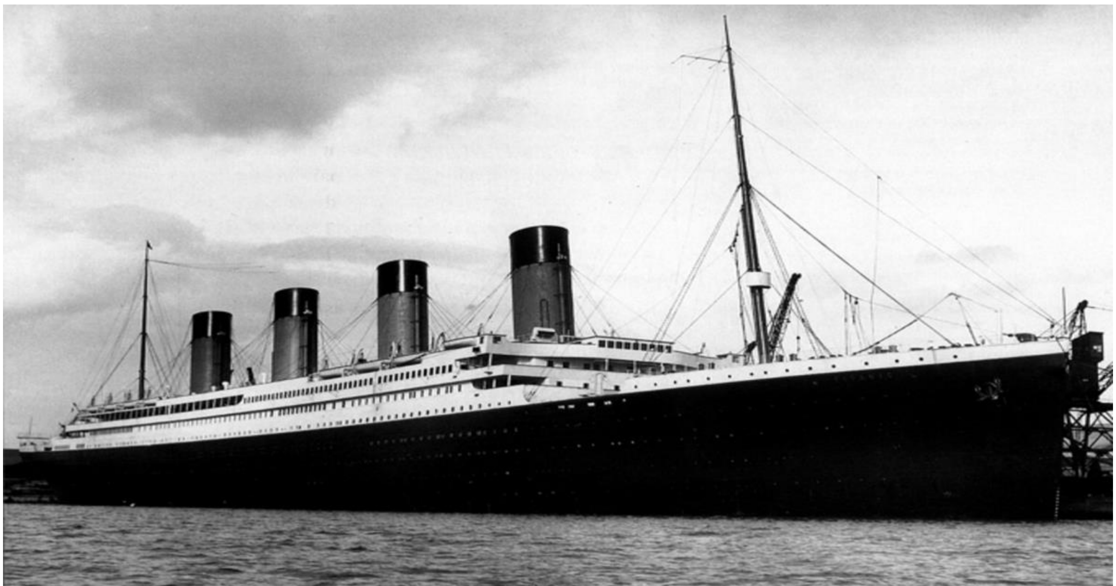

রাত তখন ১২টা ৩০। আস্তে আস্তে টাইটানিকের সামনের দিক পানিতে ডুবে যেতে থাকে। সামনের দিকটা ডুবে গেলো পানির তলায় আর পেছনের দিকটা শুন্যে ভেসে উঠে একদম ৪৬ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। ডেক এর উপরে কয়েকশো মানুষ পেছনটাকে আকড়ে ধরে কোনোরকম ভাবে ভেসে থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু টাইটানিকের পেছন দিকটা ছিলো

ভীষণ ভারী। ফলে ওইরকম লম্বাভাবে পানিতে দাঁড়ানো ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। তাই আর অক্ষত সমাধী হলো না টাইটানিকের। ঠিক মাঝখান বরাবর ভেঙ্গে গেল টাইটানিক।পানির উপর আছড়ে পড়ল পেছন দিকটা। তার পর সামনের অংশের টানে আস্তে আস্তে পানির নিচে তলিয়ে গেলো পেছন দিকটা।

১২০০০ ফিট সমুদ্রের কালো পানির নিচে হারিয়ে গেলো উনিশ শতকের এক অহমিকা। বিস্কুটের মতো টুকরো টুকরো হয়ে গেল সব। টাইটানিকের পানিতে ণিমজ্জনের ঘটনায় এই বিপুল মানুষের মৃত্যুর জন্যে দায়ী আটলাণ্টিকের ঠাণ্ডা পানি। টাইটানিকের ডোবার সময়কালে পানির তাপমাত্রা ছিলো মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যেটা মানুষকে বরফ বানাতে ২ মিনিট এর বেশী সময় নিত না।

পরে জানা যায় ক্যালিফোরনিয়ান নামক এক জাহাজ নাকি এই দুর্ঘটনা স্থলের কয়েকশো মিটারের মধ্যেই ছিলো । দূর থেকে জাহাজের কর্মীরা টাইটানিকের আলো নিভে যেতে দেখেও তা গুরুত্বে নেন নি। তবে টাইটানিক থেকে ছোড়া ডিস্ট্রেস রকেট দেখেও কেন তারা সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন নি সেটা জানা যায় নি।

টাইটানিক তৈরি করতে লেগেছিলো বছরের পর বছর কিন্তু তলিয়ে গেল মাত্র ২ ঘন্টায়। বরফের ধাক্কায় ডুবে যাওয়া টাইটানিক এই শতকের গোড়ার দিকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অহমিকার চিহ্ন হোক বাঁ না হোক এই শতকের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মধ্যে একটি তাতে সন্দেহ নাই।

পর্বঃ০৫

টাইটানিক এক্সপেডিশন বা আবিষ্কার

(TITANIC's Discover Misson on Expedition)

১৯৮৫ সালে সমুদ্রের ১২০০০(বারো হাজার) ফিট নিচে আবিষ্কৃত হয় টাইটানিকের ভাংগাচোরা ধ্বংসাবশেষ। দীর্ঘ ৭৩ বছর পর টাইটানিককে খুঁজে পান রবার্ট বালারড নামক এক ফরাসি বিজ্ঞানী। ১৯৮৫ সালে এর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ১৯১২ সালের ডুবে যাওয়া টাইটানিকের ঘটনা প্রবল্‌ভাবে নাড়া দেয় এই ফরাসি বিজ্ঞানীর মনে।

(টাইটানিকের বো সাইড" সামনের অংশ")

তখন তিনি এই টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারে নামেন।টাইটানিকের সম্পর্কে সমস্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্য এক পরিবেশে তিনি ঘাটতে থাকেন সব।বের করে ফেলেন ডুবে যাওয়ার আগে টাইটানিকের রেডিও অফিসার জ্যাক ফিলিপস থেকে কারপাথিয়া জাহাজকে পাঠানো টাইটানিকের শেষ অবস্থান। বিজ্ঞানি রবারড বিষয়টিকে আরো পরিস্কার করে নেয়ার জন্যে যান টাইটানিকের নির্মাতা সংস্থা হোয়াইট স্টার লাইনের কাছে। সেখান থেকে তিনি টাইটানিকের ডুবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত জাহাজের পাঠানো বার্তাগুলি ও টাইটানিক জাহাজ সম্পর্কে এক পরিপূর্ণ ধারনা লাভ করেন।

তিনি সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে আলাদা একটি রিসার্চ ভেসেল এ করে সেই জায়গায় চলে যান যেখান হতে টাইটানিক তার বাচার শেষ আকুতি জানিয়েছিলো। তিনি কম্পিউটারাইজড সাবমারসিবল" অ্যারন" কে পাঠান পানির ১২০০০ ফিট নিচে।

সাবমারসিবল অ্যারন সাইড স্ক্যান সোনার পদ্ধতিতে আন্ডারওয়াটার এর কিছু ছবি তুলে আনে। সাইড স্ক্যান সোনার পদ্ধতি হচ্ছে তরংগ প্রেরনের মাধ্যোমে বাধাপ্রাপ্ত বস্তুর একটা থ্রিডি লে আউট এর ছবি তোলা যায়। এক্ষেত্রে টাইটানিক এর থেকে আলাদা হওয়া ছোট ছোট বস্তুর অনেক সফট থ্রিডি লে আউট তুলে আনে অ্যারন। তারপর তুলে আনে টাইটানিকের বো সাইড এর থ্রিডি পিকচার।

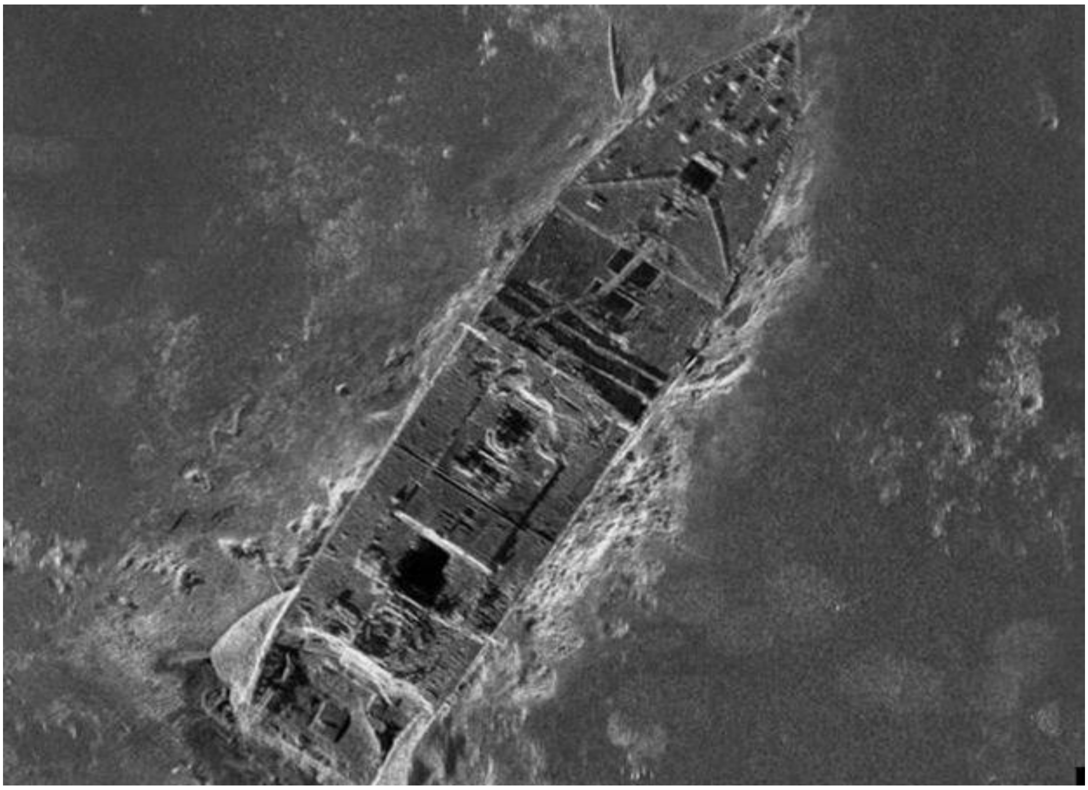

(অ্যারন থেকে তোলা টাইটানিকের বো সাইড এর থ্রিডি লে আউট)

প্রথমে টাইটানিকের বয়লার এর পিকচার তুলে আনে। বয়লার এর ছবি দেখার পর উত্তেজনায় মুহূর্ত কাটে রিসার্চ ভেসেল এর প্রত্যেকটি অফিসারের। উত্তেজনায় থাকেন বিজ্ঞানী নিজেও। তারপর অ্যারন কে উপরের দিকের কমান্ডে নিয়ে আসা হয়। সত্যি সত্যি কোনো জাহাজের ছবি তুলছে অ্যারন। তারপর অ্যারনকে ঘুরিয়ে সামনের দিকে চালানো হয়। তখন আধার থেকে বেরোতে থাকে একটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষের অবয়ব। ঠিক যেনো ভৌতিক কল্পকাহিনী থেকে উঠে আসা কোনো এক জাহাজ। তারপর তারা বুঝতে পারেন এটাই সেই আনসিঙ্কেবল টাইটানিক। যে জাহাজকে কোনোদিন ডোবানো সম্ভব নয় সেটা কিনা সামান্যো এক বরফখণ্ডের আঘাতে আটলান্টিকের ১২০০০ ফুট পানির নিচে মর্মান্তিক ভাবে তলিয়ে যায়। ১৫০০ জন মানুষের হারিয়ে যাওয়া জীবন হয় এর নিরব সাক্ষী।

সামনের দিক পর্যবেক্ষণ শেষে পেছনের অংশের খোজ করতে থাকেন বিজ্ঞানী। অনেক খোজা শেষে পেছনের অংশের খোজ পান তারা।

(টাইটানিকের স্টারণ সাইড" পেছনের অংশ")

টাইটানিকের দ্বিখন্ডিত দুই টুকরোর মধ্যে ১৯৭০ ফুট দুরত্ব। মানে সামনের অংশের থেকে পেছনের অংশ ১৯৭০ ফুট দূরে অবস্থান করছে। টাইটানিকের সম্মুখভাগ মাটির তলায় প্রায় ৬০ ফুট গেথে আছে। ১৪ই জুলাই ১৯৮৬ টাইটানিক পুনরাবিষ্কার হয়।

প্রথম যাত্রায় টাইটানিক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার হাতে না পড়লে আজও হয়তো ভেসে থাকত নীল আটলান্টিকের জলে। কিন্তু সেটা আর হবে না কোনোদিন। পানির তলায় টাইটানিক নিজের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে গড়ে তুলেছে এক বিস্ময়কর জগত। ৪১° ৪৬′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৫০° ১৪′ পশ্চিম দ্রাঘিমায় আটলান্টিক মহাসাগরের ১২০০০ ফিট নিচে শুয়ে থাকা টাইটানিকের কঙ্কাল শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনাকেই চিহ্নিত করে না চিহ্নিত করে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাসকেও।

তাই টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষটিকে বলা হয়-
" **The Biggest Underwater Museam Of The World.**"

পর্বঃ০৬

টাইটানিক ডোবার পেছনের যুক্তি

(TITANIC's Sinking Provment Anylytics)

তিন ধনকুবেরকে হত্যার চক্রান্তঃ টাইটানিকের সলীল সমাধী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা যে তথ্যের উপর ইদানিং খুব জোর দিচ্ছেন তাও কম কৌতূহলজনক নয়। টাইটানিকের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে ছিলো সেই সময়কার সেরা তিনজন ধনকুবের। এরা হলেন জন জ্যাকর অ্যাস্টর, বেঞ্জামিন গোগেনহাম, ইসিডোর স্ট্রাস। জন অ্যাস্টর ছিলেন খনি ব্যাবসায়ী। আর যুদ্ধাস্ত্রের ব্যাবসা করতেন বেঞ্জামিন গোগেনহাম ও স্ট্রাস।

পরবর্তীকালে ব্রিটেনের পাবলিক রেকর্ডস অফিসের পুথিপত্র থেকে জানা যায় যে প্রথম শ্রেনীর ৩৪ শতাংশ পুরুষের লাইফবোটের সাহায্যে প্রাণে বেচে গেলেও এই তিনজন কেউই বাচেন নি।এই রহস্যের অনুসন্ধান চলছে অনেক।

তবে প্রশ্ন থাকে এইক্ষেত্রেও । মাত্র তিনজন যাত্রীকে হত্যা করার জন্যে এত বড় জাহাজকে পানিতে নিমজ্জনের পরিকল্পনা ঠিক বিশ্বাস করা যায় বলে মনে হয় না। পরিশেষে বলা যায় বরফের ধাক্কায় হোক আর অন্তর্ঘাতই হোক এই জাহাজের সলীল সমাধীর জন্যে যে দুর্বল রিভেটই দায়ী সে ব্যাপারে সন্দেহ নাই। আর সবচেয়ে মজার এবং হাস্যোকর বিষয় হলো ড্রাই ডক এ যখন ব্যাঙ্গের ছাতার মতো দেখতে রিভেটের এক প্রান্ত হাতুড়ি পিটিয়ে টাইটানিকে লাগানো হচ্ছিলো ঠিক তখনি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল জাহাজের সম্ভাব্যো করুন পরিনতি।

পর্বঃ০৭

হিমশৈল কি? মহাসাগরে ভেসে বেড়ায় কেন এরা?

(What is Iceburg? Why They afloat in the ocean??)

নীল সমুদ্রে ভাসমান বিশালাকায় ধবধবে সাদা বরফের দ্বীপ বা পাহাড় যা হিমশৈল বা আইসবারগ নামে পরিচিত। পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে একটি। কিন্তু দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন জাহাজের সামনে এসে পড়লে এই হিমশৈল অত্যান্ত ভয়ংকর অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়।এই আইসবারগের সাথে ধাক্কা লেগেই ডুবে যায় আনসিঙ্কেবল টাইটানিক।

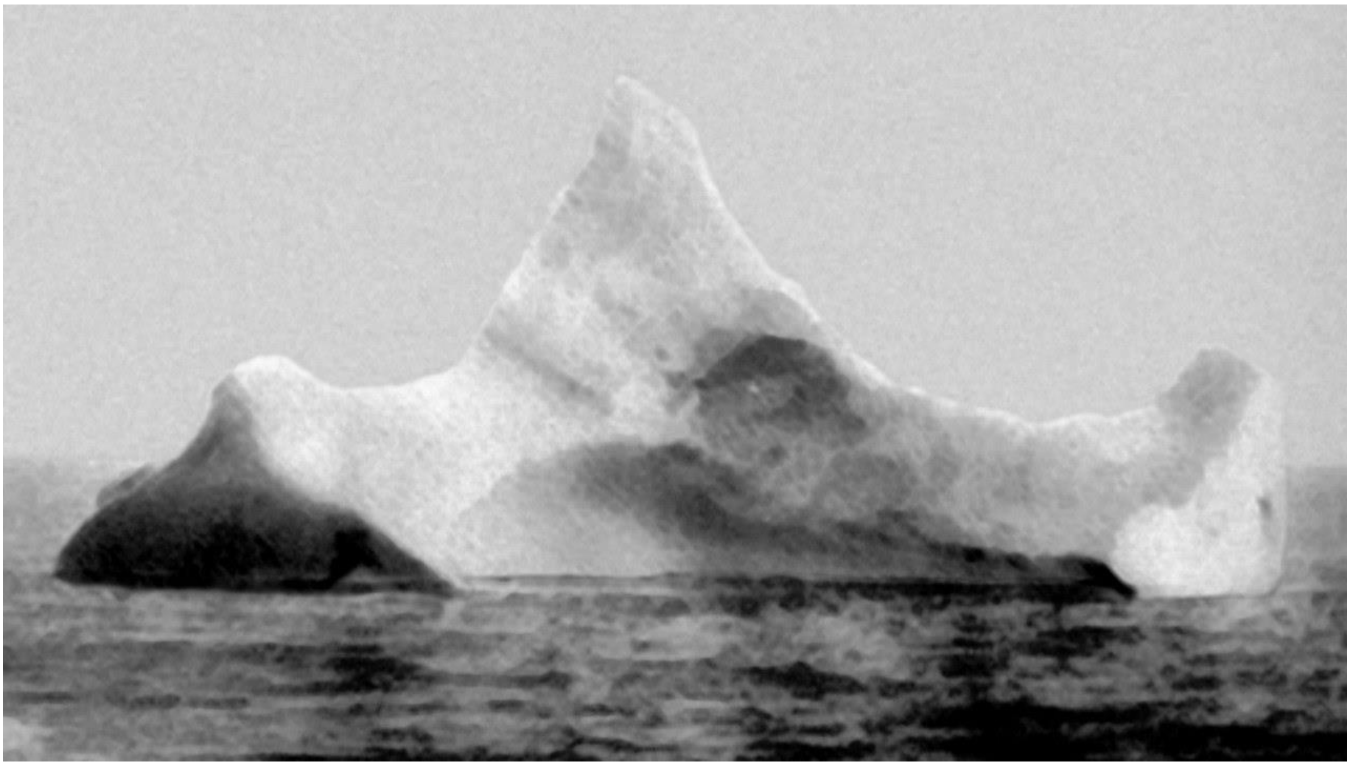

আইসবারগ নানা রকমের হয় থাকে। সাধারনত যে আকৃতির হিমশৈল খুব বেশী দেখা যায় তা উচ্চতায় ১০০ মিটারের মতো হবে। কিন্তু এমন কিছু দৈত্যাকার হিমশৈল আছে যার উচ্চতা ১০০০ মিটারের ও বেশী। ৫ থেকে ১০ মিটারের হিমশৈল ও দেখা যায়। নাবিকদের কাছে এই ধরনের ছোট ছোট হিমশৈল গ্রোলারস নামে খ্যাত। ভাসমান এই বরফের পাহাড়গুলো অবিশ্বাস্য রকমের ভারী। কিছু কিছু হিমশৈল এর ওজন ২০০,০০০,০০০ টনের কাছাকাছি। পানির নিচে অনেকটা বিস্মৃত থাকার জন্যে বায়ুপ্রবাহ এগুলোকে সহজে স্থানান্তরিত করতে পারে না। কেবল বড় ধরনের সামুদ্রিক স্রোত এগুলো এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ধীরে ধীরে ভেসে বেড়াতে পারে।

পরিক্ষা করে দেখা গেছে যে বরফ এর ওজন পানির ওজনের আট এর নয় ভাগ। সুতরাং আর্কিমিডিস এর তথ্যোনুসারে এবং সূত্রানুসারে , পানিতে ভাসমান অবস্থায় বরফের আট এর নয় অংশ পানিতে নিমজ্জিত থাকে। অবশিষ্ট এক এর নয় অংশ পানির উপরে থাকে। হিমশৈলের ক্ষেত্রে এই একই ব্যাপার ঘটে। তাই যে হিমশৈল মাত্র ৪৫ মিটার উপরে থাকে সমুদ্রের নিচে সেটা প্রায় ৩০০ মিটার পর্যন্ত বিস্মৃত থাকে।

একমাত্র টাইটানিক জাহাজ ছাড়া আর কোনো জাহাজের হিমশৈলের আঘাতে ডুবে যাওয়ার কথা শোনা যায় নি। আর এখন তো সেটা সম্ভবই না। ইদানিং নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে হিমশৈল ঘটিত আর কোনোরকমের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নেয়া হয়েছে নানাবিধ ব্যাবস্থা। এখন “ রাডার” –এর সাহায্যে জাহাজের গতিপথে হিমশৈলের উপস্থিতি আছে কিনা সেটা সহজেই শনাক্ত করা যায়। এছাড়া ইউনাইটেড স্টেটস –এর সি পুলিশ এর তত্বাবধানে তৈরী হয়েছে “ইন্টারন্যাশনাল আইস প্যাট্রোল” ।সমুদ্রে হিমশৈলের উপস্থিতি সম্পর্কে জাহাজগুলোকে সতর্ক করতে তারা সদাই কর্মরত। জাহাজের অটো পাইলটিং সিস্টেমই এখন তার গতিপথ ঠিক করে নেয়।

<u>পর্বঃ০৮</u>

টাইটানিক নিয়ে চলচিত্র

(TITANIC Cinemas)

টাইটানিক জাহাজের কাহীনি আমরা যতটুকু জানি বা এখন পর্যন্ত জেনেছি সেটা ঘাটাঘাটি না করলেও আমাদের জানাতে সহায়তা করেছে টাইটানিক জাহাজ নিয়ে নির্মিত হওয়া চলচিত্রগুলো। টাইটানিক চলচিত্রের নাম উঠলেই এক কথায় উঠে আসে হলিউডের সফল ডিরেক্টর জেমস ক্যামেরন এর "টাইটানিক" সিনেমাটির কথা। যেটা ১৯৯৭ সালে মুক্তি পেয়েছিলো। এই পর্বে আমি আপনাদের আরো কয়েকটি চলচিত্রের কথা বলতে যাচ্ছি যেগুলো টাইটানিকের সেই হৃদয়বিদারক পটভুমী থেকে বানানো হয়েছিলো।

<u>A NIGHT TO REMEMBER (1958):-</u> ১৯৫৮ সালে মুক্তি পায় রয় ওয়ার্ড বেকার পরিচালিত " এ নাইট টু রিমেম্বার" সিনেমাটি। এখানে এই সিনেমাটি কিছুটা ডকুমেন্টারি আকারে করা হলেও ঘটনাপ্রবাহ গুলো ছিলো সব সত্যিকারী টাইটানিকের সাথে মিল রেখে।

<u>SOS TITANIC:</u> ১৯৪৯ সালে মুক্তি পায় বিলি হেইল পরিচালিত "এস ও এস টাইটানিক"।কাহীনি পটভুমি সত্যিকারের টাইটানিক এর সাথে আংশিক মিল রয়েছে। কিন্তু এই সিনেমাটিতে টাইটানিককে কাত করে ডোবানো হয়েছে যেটা আসল টাইটানিকের সাথে মিলে না।

<u>TITANIC-2 :</u> ১৯৬৬ সালে মুক্তি পায় ব্রুস স্টিফেনশন পরিচালিত টাইটানিক টু। ছবিতে একটি ভিন্ন রকম টাইটানিককে দেখানো হয়েছে যেটা আসল টাইটানিকের ডিজাইন বহির্ভূত। ছবির টাইটানিক জাহাজ এক সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে ডুবে যায়। আসল টাইটানিকে যেটা বরফখন্ডো ছিল টাইটানিক টু তে সেটা বিশালাকার সামুদ্রিক ঢেউ হয়ে আসে।

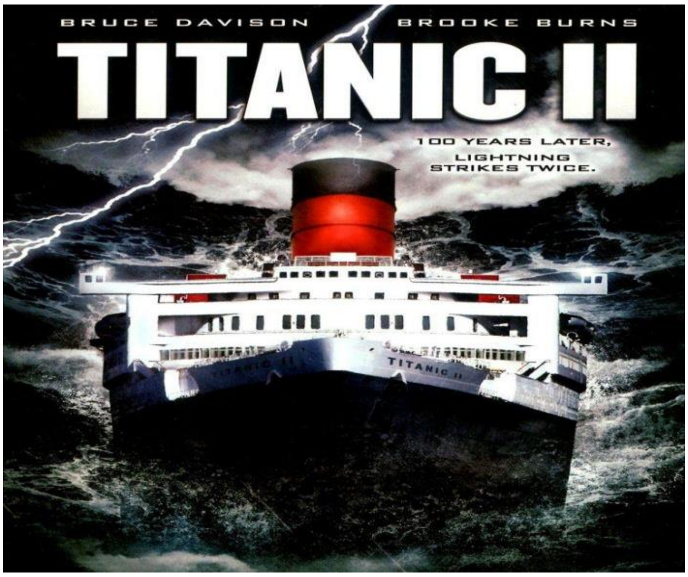

<u>RAISE THE TITANIC:</u> এই সিনেমাটির কাহীনির পটভুমি হচ্ছে ১০০ বছর আগে ডুবে যাওয়া টাইটানিককে উদ্ধার করা। যদিও কথাটি একরকম অবিশ্বাস্যোই শোনায় তারপরেও ছবির কাহিনিতে সেটাই করা হয়েছিলো। সমুদ্রের তলা থেকে টাইটানিককে উঠিয়ে আনার এক প্রচেষ্টা। সিনেমাটি বক্স অফিস ফ্লপ হয়।

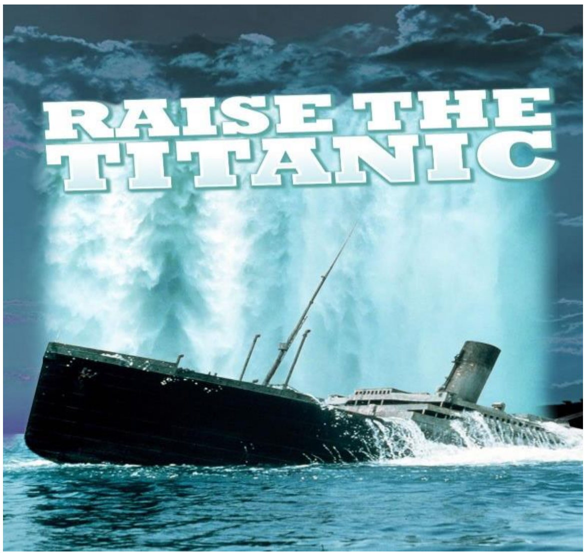

TITANIC (1997): আজ টাইটানিককে জানার চেয়ে যতটা বেশী দেখেছি সেটা এই সিনেমাটির কল্যানে। ১৯৯৭ সালে জেমস ক্যামেরনের হাত ধরে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমাটিতে ১০০ বছর আগে ডুবে যাওয়া টাইটানিককে খুবই নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ব্যাবহার করা হয়েছে ৫০০ টির ও বেশি কম্পিউটার ইমেজিং গ্রাফিক্স । সিনেমাটিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও এবং নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কেট উইন্সলেট।

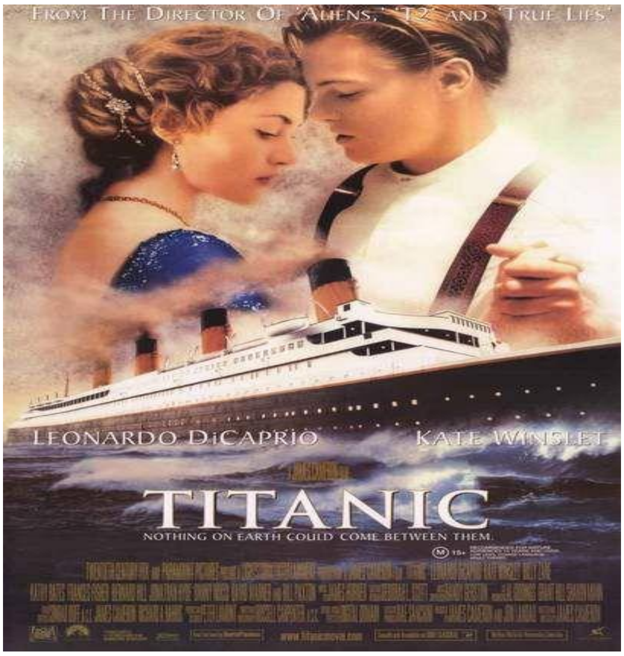

TITANIC (BIRTH OF A LEGEND…2002): ২০০২ সালে মুক্তি পাওয়া এই ডকুমেন্টারি সিনেমাটিতে দেখানো হয়েছে ১০০ বছর আগে টাইটানিকের জন্ম ইতিহাস। বিশেষ করে যারা এখন পর্যন্ত এই সিনেমাটি দেখেন নি তারা দেখে নিতে পারেন। এই সিনেমাটি থেকে টাইটানিক সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যো জানা সম্ভব।

পর্বঃ০৯

জানা অজানার টাইটানিক

(Known Unknown of TITANIC)

- ১৯১২ সালে তৈরি টাইটানিকের গায়ে লেখা ছিলো “৩৯০৯ এন এম ” এই নম্বরটি। যা উলটে দিলে দাঁড়ায় “NO POPE ” কথাটি।পানিতে যার প্রতিসম করলে দাঁড়ায় “কিছুই না”।
- এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ একটি ফরাসি অয়েল ট্যাংকার। ৪১৫ মিটার লম্বা এই জাহাজটি দৈর্ঘে সিডনি হারবার ব্রিজ এর সমান। উল্লেখ করা হলো যে টাইটানিকের দৈর্ঘ্য ছিল ২৭৫ মিটার।
- টাইটানিক (১৯৯৭) সালের ছবির খরচ আসল টাইটানিক বানানোর খরচকে ছাড়িয়ে যায়। এই ছবি তৈরি করতে খরচ হয় ২০০ মিলিয়ন ডলার। আর টাইটানিক জাহাজটি বানাতে খরচ হয়েছিলো তৎকালীন সময়ের ৭৫ লক্ষ ডলার।
- টাইটানিক যখন ডুবতে বসেছে তখন কোটিপতি ব্যাবসায়ী বেঞ্জামিন গোগেনহাম লাইফবোটে না উঠে দামী সান্ধ্যো পোশাক পরে নিজেকে নিয়েই ব্যাস্ত ছিলেন।
- টাইটানিকের একজন মহিলা যাত্রী এখনও জীবিত রয়েছেন। তবে ভয়ংকর সেই রাতের কিছুই তার মনে নেই।কারন ঘটনার দিন তার বয়স ছিলো মাত্র ৬ মাস।
- যে বরফের সাথে টাইটানিক ধাক্কা খায় তখন টাইটানিকের গতিবেগ ছিলো ঘন্টায় ৩০ মেইল। টাইটানিকের ৫ দিনের আয়ুর তুলনায় ওই বরফের আয়ু ছিলো তিন লক্ষ বছর।
- ১৯৮৬ সালে আটলান্টিকের তলা থেকে তুলে আনা হয় টাইটানিক ধ্বংসাবশেষের এক টুকরো। পানির উপর তুলে আনা এটিই টাইটানিকের সর্ববৃহৎ অংশ বা “বিগ পিস” নামে পরিচিত।
- ১৯১২ সালের ১৫ই এপ্রিল টাইটানিক মিলিয়ে যায় সমুদ্রের তলায়। ১৯৯৮ সালে এই দিন সকালে আটলান্টিক মহাসাগরের যে জায়গায় এই বিশাল জাহাজটি ডুবেছিল সেখানে একটি হেলিকপ্টার দিয়ে ছড়িয়ে দেয়া হয় ফুল।
- সর্বশেষ খবরে জানা গেছে টাইটানিক সিনেমার দ্বিতীয় খণ্ড বানানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

পর্বঃ১০

এক নজরে টাইটানিক

(One Eyed See TITANIC)

পুরো নাম	**রয়্যাল মেইল স্টীমার টাইটানিক**
মালিকানা সংস্থা	**হোয়াইট স্টার লাইন**
প্রস্তুতকারক সংস্থা	**হারল্যাণ্ড অ্যাণ্ড উলফ**
জাহাজটির দৈর্ঘ্য	**৮৮২ ফিট ৯ ইঞ্চি**
জাহাজটির উচ্চতা	**১০৪ ফিট**
জাহাজটির ওজন	**৬০,০০০ টন**
ইঞ্জিনের ক্ষমতা	**৪৬,০০০ অশ্বশক্তি**
সর্বোচ্চ গতিবেগ	**২২ নট**
জাহাজটির দাম	**১,২৫০,০০০ পাউণ্ড**
রাডারের দৈর্ঘ্য	**৭৮ ফিট ৪ ইঞ্চি**
রাডারের ওজন	**১০১ টন**
প্রপেলার সংখ্যা	**৩টি**
প্রপেলারের ধাতব উপাদান	**ম্যাঙ্গানিজ ব্রোঞ্জ**
লাইফবোটের সংখ্যা	**১৬ টি**
ডেকের সংখ্যা	**৮টি**
চিমনির সংখ্যা	**৪টি**
প্রথম যাত্রার সময়	**১৯১২ সালের ১০ই এপ্রিল**
প্রথম যাত্রাপথ	**ইংল্যাণ্ডের সাউদাম্পটন হয়ে নিউইয়র্ক**
যাত্রী সংখ্যা	**২২২৩ জন (ক্র সহ)**
জাহাজ কর্মী	**৮৮৫ জন**
জাহাজের ক্যাপ্টেন	**ই জে স্মিথ**
দুর্ঘটনার সময়	**১৯১২ সালের ১৪ই এপ্রিল রাত ১১টা ৪০**
দুর্ঘটনার স্থল	**উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরের নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড।**
সলিল সমাধী	**১৫ই এপ্রিল রাত ২ টা ২০**
মৃতের সংখ্যা	**১৫০০ জন**
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার	**৪১° ৪৬′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৫০° ১৪′ পশ্চিম দ্রাঘিমায় আটলান্টিক মহাসাগরের ১২০০০ ফিট নিচে।**

পর্বঃ১১

টাইটানিকে কারীগরী ভুল

(Some Technical Faults Of TITANIC)

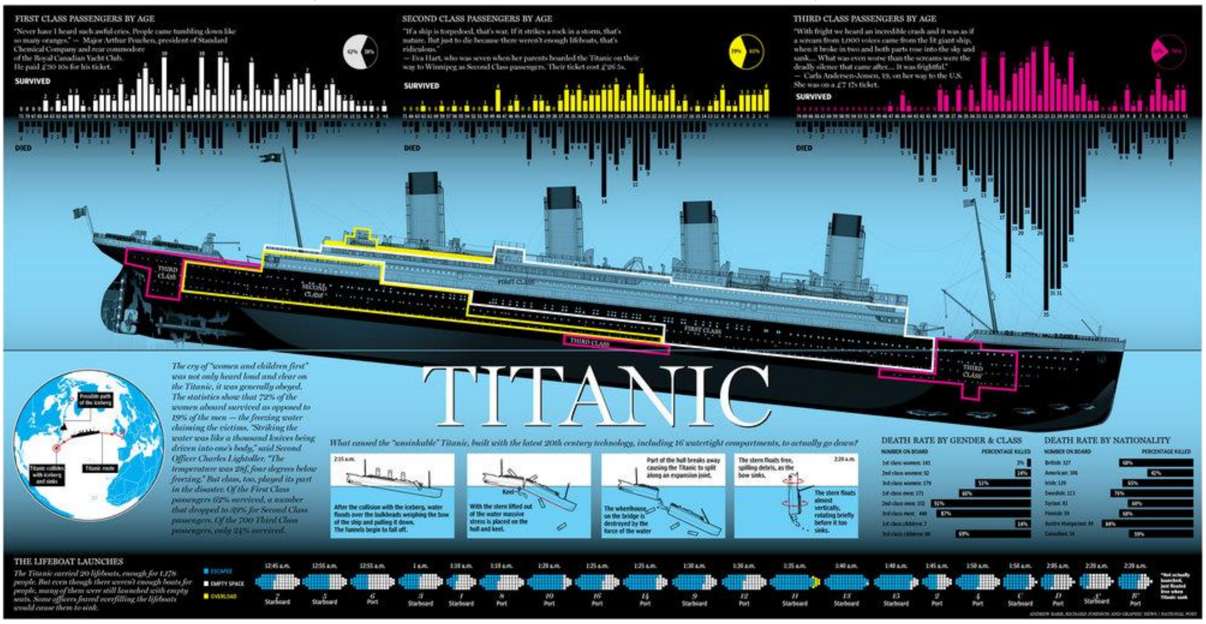

পর্বের শিরোনামটি দেখে নিশ্চয়ই অবাক লাগছে? লাগাটাই স্বাভাবিক। কারন কেউ কোনোদিন আশাই করেন নি যে টাইটানিকের মতোন অতিকায় জাহাজটির মধ্যে কি কারিগরি ভূল থাকতে পারে?!! সেটাই ব্যাখ্যা করছি। আপনার মতো গোটা বিশ্ব ধাধায় পড়ে গিয়েছিলো যখন টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা লোহার রিভেট এর কেমিক্যাল রিপোর্ট এক অজানা সত্যকে উন্মোচন করে।

অনেকের মতে টাইটানিকের স্টীল প্লেটে জোড়া লাগানো লোহার রিভেটের গোলযোগের কারণে ডুবেছে টাইটানিক। সে বিষয়ে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নথিপত্রে পাওয়া যায়। এই জাহাজে ব্যাবহার করা রিভেটগুলি দুর্বল ই ছিল না বরং এর ডিজাইনে ছিলো বিস্তর ভুলে ভরা। টাইটানিকের ডুবে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে দুটি রিভেট উদ্ধার করা হয়। মরচে পড়া লোহার রিভেটদুটি পরীক্ষা করে জানা গেছে এক চমকপ্রদ ফলাফল। রিভেটের কেমিক্যাল পরিক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পেটা লোহার ওই রিভেট এ বিস্তর গাদ ছিলো। ভেজাল মেশানো ওই লোহাগুলোই নাকি দুর্বল করে দিয়েছিলো রিভেটগুলিকে।

(টাইটানিকে ব্যাবহার করা লোহার রিভেট)

টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে গবেষণা করে একজন প্রধান শ্রেণির নৌ স্থপতি বিশেষজ্ঞ উইলিহাম এইচ গারজকে জানিয়েছেন যে হিমশৈলের ধাক্কায় রিভেটগুলি খুলে যাওয়ায় হু হু করে সাগরের শীতল ও ভারী পানি ঢুকতে শুরু করে দিয়েছিলো টাইটানিক জাহাজে। টাইটানিকের খোলের ইস্পাতগুলো জোড়া দিতে প্রায় ৩০ লক্ষের ও বেশী রিভেটের প্রয়োজন হয়েছিলো।অনেকের মতামত এতগুলো রিভেটের মধ্যে ২টিতে গাদ থাকলে প্রমাণ হয় না যে প্রতিটি রিভেটেই একই গাদ মেশানো ছিলো। কিন্তু বর্তমান অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে যে ইস্পাতের পাত ফেটে গিয়ে নয় , পানি ঢুকে গিয়েছিলো রিভেটের জোড় খুলে গিয়ে।

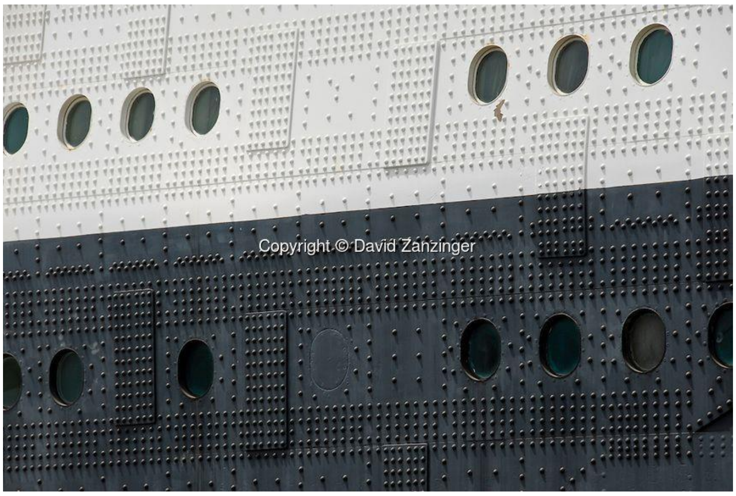

(জাহাজে ব্যাবহার করা রিভেটের ডিজাইন)

গত ২ বছর ধরে উইলিহাম এইচ গারজকে একদল বিশেষজ্ঞ ডুবুরী দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছেন যেখানে টাইটানিক ডুবেছে তার চারপাশের প্রায় আড়াই মেইল এলাকা। সমুদ্রের তলায় নরম পলিমাটির মধ্যে গেথে গেছে টাইটানিকের সামনের দিকে খোলের যে অংশ , সেই স্থানের পলির স্তর কেটে সরিয়ে দেখেছেন ডুবুরীরা অন্তত ১০ টি জায়গায় ইস্পাতের পাতগুলি জোড় থেকে খোলা। অথচ একটি পাতও দোমড়ানো মোচরানো নয়। এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে সেগুলো।

গারজকের মতে ইস্পাতের পাতগুলি যে ভাঙ্গা নয় তাতেই প্রমাণ হয় যে, হিমশৈলের ধাক্কায় টাইটানিকের খোলের প্রায় ৩০০ ফুট লম্বা ছিদ্র দিয়ে পানি ঢোকা প্রায় অবাস্তব বলেই মনে হয়। পঞ্চাশজন ডুবুরীর চোখে ও দুরনিয়ন্ত্রিত ক্যামেরার লেন্সে তেমন কোনো ছিদ্র ধরা পড়ে নি।

ইন্টারন্যাশনাল শিপ রিসার্চ ম্যানেজমেণ্ট এর অধ্যাপক ডাক্তার ফোয়েকের মতে,

টাইটানিকে যে রিভেট গুলো ব্যাবহার করা হয়েছিলো তাতে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় গাদ মেশানো হয়েছিলো। স্বাভাবিক লোহায় সাধারনত ২ থেকে ৩ ভাগ আনুপাতিক হারে গাদ মেশানো হয় যাতে লোহার দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু টাইটানিকের রিভেটের গাদের পরিমান ছিলো ৯ পয়েণ্ট ৩ ভাগ।

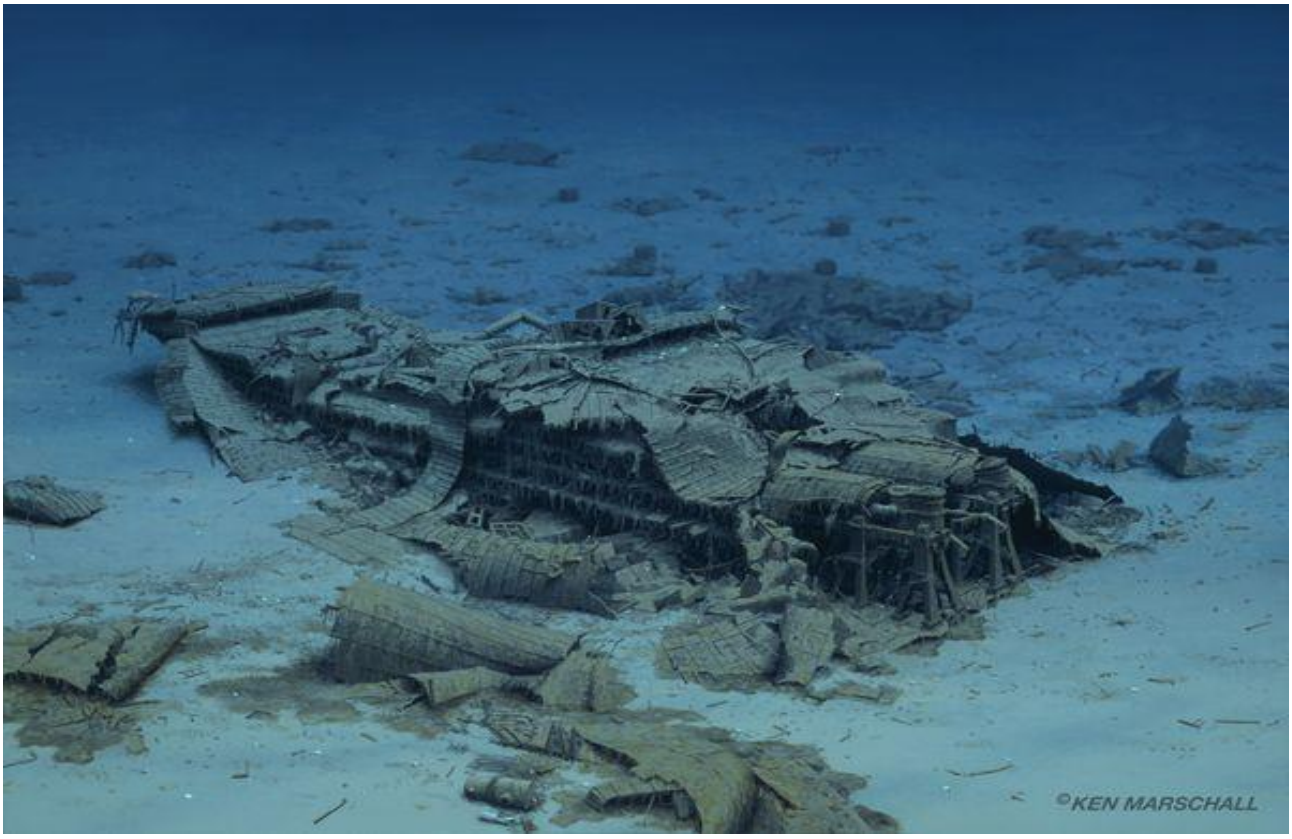

এখান থেকেই মানুষের মনে সন্দেহের দানা বাধতে শুরু করে। ভূলের পরিমান কি এতই যে , গাদের পরিমাণ ৩ ভাগ থেকে শতকরা ৯ ভাগের উপরে পৌঁছে গেল??!! এটা কি সত্যিই অজানার ভূল? পুরোনো নথিপত্র ঘেটে দেখা গেছে যে , ৩০ লাখের বেশী রিভেট তৈরি করতে দেয়া হয়েছিলো একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি কে।

এক্ষেত্রে ধরে নেয়া যেতে পারে টাইটানিকে যে সমস্ত রিভেটগুলি ব্যাবহার করা হয়েছিলো তার সবগুলোতেই লোহার ও সিলিকনের পরিমান ঠিক একইরকম আছে । এই অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে নৌ ইতিহাসে টাইটানিক সেই সময়ের সবচেয়ে বিশাল জাহাজ নয় বস্তুত সবচেয়ে দুর্বল জাহাজ ছিলো!!

আজ থেকে ১০৮ বছর আগে ডুবে যাওয়া এই জাহাজটিকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে জানা যাচ্ছে নতুন নতুন সব অজানা তথ্যের কথা। চলছে বৈজ্ঞানিক মহলে নানা জল্পনা , কল্পনা , গবেষণা ও উদ্ধারকার্য। চলবে হয়তো আরো বহু বছর ধরে।

<u>**পর্বঃ১২**</u>

জাহাজ দুর্ঘটনা

(SHIP DISASTERS)

স্বভাবগত বা প্রাকৃতিক গত কারনে সাগরে ও মহাসাগরে চলাচলকারী জাহাজগুলি বিপদের মুখে পতিত হয়ে যেসকল দুর্ঘটনার স্বীকার হয় সেটাই জাহাজ দুর্ঘটনা । যেকোনো যানের চালক চান না তার যানটি দুর্ঘটনার মুখে পতিত হোক। শত সাবধান থাকার পরেও দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়। ভাগ্যে ভালো থাকলে জীবন বাচে নইলে যাত্রীসহ সকলের জীবন নাশ হয়। অনেক সময় দক্ষ চালকের ফলে জীবন রক্ষা পায় বটে কিন্তু যানের প্রচুর ক্ষতি হয়। স্থলপথ , আকাশপথ, জলপথ সব স্থানে অহরহ যান চলাচল করছে। কেউ বলতে পারবে না কোন পথটা বেশী নিরাপদ!।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দুর্ঘটনা কেন হয়?? কেন জাহাজ পানিতে ডুবে যায়?

আমরা টাইটানিকের ডুবে যাবার কাহীনী পাঠ করে জানতে পেরেছি টাইটানিকের ডুবে যাবার কারণ সম্পর্কে । তাই যে কারনেই বাঁ যেভাবেই জাহাজ ডুবুক তাতে যে কি পরিমান ক্ষতি হয় সেটা সহজেই বোঝা যায়। তাই জাহাজডুবি কারোরই কাম্যো নয়। নিচে আমি কিছু ভয়াবহ জাহাজডুবির ঘটনা পেশ করছিঃ-

- <u>**এস এস নরোনিক ট্রাযেডিঃ-**</u> ১৯১৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পানিতে ভাসানো হয় ১০০ মিটার দৈর্ঘ্য এর একটি সুন্দর জাহাজ। আধুনিক বিলাস সামগ্রির সবই ছিলো জাহাজটির মধ্যে। জাহাজটির নাম ছিলো "এস এস নরোনিক"। ৬৭০০ টন ওজনের এই জাহাজটি আমেরিকার হ্রদ অঞ্চলে ৩৬ বছর যাত্রি পরিসেবায় নিয়োজিত ছিলো।

এস এস নরোনিক

১৯৪৯ সালের ১৬ ই সেপ্টেম্বর । নরোনিক টরেন্টো বন্দরে নোঙ্গর করে কিছু যাত্রী এবং মালামাল উঠায়। সবমিলিয়ে জাহাজে ৫২৪ জন এর মতো যাত্রী ছিলো। রাত দেড়টার দিকে জাহাজটি যখন হ্রদে চলছিলো তখন জাহাজের ওয়াচ ম্যান জাহাজের পেছনে আগুন লক্ষ করেন। খবর পাঠানোর ৬ মিনিটের মধ্যে এক দমকল বাহীনি আগুন নেভাতে আসে, কিন্তু এই ৬ মিনিটে ছোট্ট আগুনটি ভয়ঙ্কররুপ ধারণ করে ফেলে। এতটাই ভয়ংকর যে ঠিক ১৫ মিনিট পরে ১৭ টি দমকল বাহীনি তার কাছে হারতে বসে।
যে সকল যাত্রীরা জেগে ছিলেন তারা আগুনের আচ পাওয়ার সাথে সাথে পালাবার চেষ্টা করেন। এর ফলে প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। প্রাণ রক্ষার তাগিদে আতঙ্কগ্রস্থ যাত্রীরা একজন আরেকজনের ঘাড়ে পড়তে থাকেন। এইভাবে পদদলিত হয়ে বহু যাত্রীর মৃত্যু ঘটে। বহু যাত্রী ডেক থেকে পানিতে ঝাপ দেন।
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১২০ জন যাত্রীর মৃত্যু ঘটে।অনেক যাত্রী সপরিবারে অগ্নিদগ্ধ হন।

- **<u>আর এম এস লুসিতানিয়া ট্রাযেডিঃ-</u>** সময় ১৯০৩। ব্রিটিশ ম্যারীটাইম সোসাইটি প্রথম ডিজাইনের জাহাজ " আর এম এস লুসিতানিয়া "। ৫৭০ ফুট লম্বা ও ৫৬ ফুট প্রস্থের অধিকারী এই জাহাজের নির্মাণ সংস্থা ছিলো " কুনারড লাইন"। ১২৩৮ জন যাত্রি নিয়ে লুসিতানিয়া শেরবুরগ হতে পাপেনবারগ এর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ১৯০৭ সালের ১২ই মার্চ ।

(আর এম এস লুসিতানিয়া)

যাত্রা করার ২ দিন পর । লুসিতানিয়া জার্মানি এর জলরেখায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে । জার্মানির জলসীমানায় থাকা সাবমেরিন গ্রে এস ভি ৭৭৮ডি পর্যবেক্ষণ করল তাদের জলসীমানায়

একটি নতুন জাহাজ প্রবেশ করতে যাচ্ছে। যেহেতু লুসিতানিয়ার এটিই ছিলো প্রথম যাত্রা সেহেতু নতুন দেশে অফিসিয়াল্‌ভাবে অ্যানাউন্স করা হয় নি সে সম্পর্কে । তাই যখন জলসীমানায় সে প্রবেশ করল সাবমেরিন গ্রে এস ভি এটিকে শত্রুদেশের জাহাজ ভেবে এক মিসাইল টর্পেডো ছুড়ে। টর্পেডো ছোড়ার ৪৫ সেকেন্ড এর মধ্যে সেটা লুসিতানিয়ার পোরটসাইডে আঘাত করে। এবং পানি ঢোকা শুরু করে দেয় জাহাজটিতে। মানুষেরা নিজ কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন কি হয়েছে তা দেখার জন্যে। কিন্তু খুবই দ্রুত কাত হয়ে যেতে থাকে জাহাজটি। লাইফবোট পরিচালনাও অসম্ভব হয়ে পড়ে অফিসারদের পক্ষে। টর্পেডো আঘাত করার ১৮ মিনিটের মাথায় ব্যাল্টিক সাগরে ডুবে যায় লুসিতানিয়া। এটা এতটাই দ্রুত ডুবে যাচ্ছিলো যে লাইফবোট নামানো সম্ভব হয় নি কারও পক্ষে । এই দুর্ঘটনায় ১২০০ যাত্রীর সলীল সমাধী হয়ে যায়।

- **<u>এস এস অ্যাণ্ড্রা ডোরিয়া ট্রাযেডিঃ</u>** ইতালির বিলাসবহুল জাহাজ অ্যাণ্ড্রা ডোরিয়া ইতালির বাণিজ্য জাহাজগুলোর মধ্যে একটি। ১৯৫৬ সালের ১৭ই জুলাই গেনেয়া থেকে নিউইয়র্ক এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে জাহাজটি। আট দিন সমুদ্রে ভাসার পর ২৫ শে জুলাই রাতে জাহাজটি যখন নান্‌টুকেট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন এই অঞ্চলটি ছিলো ঘন কুয়াশাছন্ন।

(এস এস অ্যাণ্ড্রা ডোরিয়া)

কুয়াশাছন্ন পরিবেশে আশেপাশের জাহাজগুলোকে সতর্ক করার জন্যে জাহাজটি সাইরেন বাজিয়ে চলছিলো। এই জাহাজটির মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে ছিলো অপর একটি জাহাজ। যার নাম ষ্টকহোম। রাত ১১টা ২০ মিনিটে জাহাজ দুটি একই জায়গায় এসে পড়ে এবং ষ্টকহোম অ্যাণ্ড্রাডোরিয়াকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুটি জাহাজের রাডার থাকায় তারা একে অপরের গতিপথ ধরতে পেরেছিলো কিন্তু তারা নিজেদের পথ পরিবর্তনে অসফল হয়।

ষ্টকহোমের সামনের দিকটা দুমড়ে মুচড়ে গেলেও অ্যাণ্ড্রা ডোরিয়ার খোলটি ১১ মিটার জায়গা জুড়ে ফেসে যায় সেখান থেকে সাগরের পানি ঢুকতে থাকে। অ্যান্ড্রাডোরিয়ার ডানদিকটি পানিতে ভরে যায় । কিন্তু আশার কথা হলো মাত্র ৮৬ জন বাদে বাদ বাকি সকল যাত্রীদের ষ্টকহোমে তুলে নেয়া হয়। কারন এই ৮৬ জন অ্যাণ্ড্রা ডোরিয়ার এমন এক স্থানে ঘুমাচ্ছিলেন যখন জাহাজটি ধাক্কা খায় তখন তারা জেগে উঠেন ঠিকই কিন্তু তাদের জাহাজ থেকে বের হবার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে পরের দিন সকাল ১০ টার মধ্যেই অ্যাণ্ড্রাডোরিয়া সমুদ্রে ডুবে যায়।

- **<u>আর এম এস কারপাথিয়া ট্রাযেডিঃ</u>** টাইটানিক ডুবির পরে এই জাহাজটি বেঁচে যাওয়া টাইটানিকের সকল যাত্রীদের নিয়ে নিউইয়র্কে চলে গিয়ছিলো। এই জাহাজটির জন্যে টাইটানিক এর ৭০০ যাত্রী বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এই জাহাজটিও সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যায়।

(আর এম এস কারপাথিয়া)

- **<u>এমভি ডোনাপাজ ট্রাযেডিঃ</u>** টাইটানিক এর পরে এই যুগের মর্মান্তিক জাহাজ দুর্ঘটনা ঘটে ফিলিপাইন্স এর সমুদ্রে। ১৯৮৭ সালের ২০ ই ডিসেম্বর " ডোনা পাজ" নামে একটি যাত্রিবাহী জাহাজ এর সাথে "ভিক্টোর" নামক এক তেলের ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষের ফলে এই দুর্ঘটনা টি ঘটে।

(এমভি ডোনা পাজ)

ডোনাপাজ জাহাজটি ১৫০০ যাত্রিদের নিয়ে যাচ্ছিলো টাক্লোবান থেকে ফিলিপিন্স এর রাজধানী ম্যানিলার দিকে। পাচদিন পরেই ছিলো বড়দিন যাত্রীরা খুবই হৈ হুল্লোড় করতে করতে ম্যানিলার পথে রওনা হয়েছিলো। অপরদিকে ভেক্টোর ৮৩০০ ব্যারেল পেট্রোল নিয়ে বাতাস শোধনাগার থেকে ম্যাসবেট দ্বীপের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।

২৪ জন কর্মীর পরিচালনায় এই জাহাজটি ডোনাপাজের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। রাতের অন্ধকারে জাহাজদুটির মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ ঘটে এবং দুটি জাহাজেই আগুন লেগে যায়। ট্যাঙ্কার থেকে বহু ব্যারেল পেট্রোল পানিতে পড়ে যাওয়ায় পানির উপর বিশাল এলাকা জুড়ে আগুন জ্বলে উঠে।

ঘটনার আকস্মিকতায় ডোনা পাজের ঘুমন্ত যাত্রীরা হকচকিয়ে যান। আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে তারা এদিক অদিক দৌড়াতে থাকেন । কিন্তু গোটা জাহাজই তখন আগুনের গোলায় পরিণত হয়ে গেছে। বেগতিক অবস্থা দেখে যাত্রীরা পানিতে ঝাপ দেয়া শুরু করেন। বিশাল অঞ্চল জুড়ে থাকা এই আগুন থেকে বাঁচার কোনো সুযোগই পান নি যাত্রীরা। ১৮৯৩ জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পর্বঃ১৩

টাইটানিক নিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলের প্রতিবেদন

(Many Channel Documentary For TITANIC)

১৯১২ সালের ডুবে যাওয়া টাইটানিক কে নিয়ে এখন পর্যন্ত ই অনেক চ্যানেল সমুদ্রের তলায় অভিজান চালিয়ে ডকুমেন্টারী তৈরি করেছে। তার মধ্যে ন্যাশনাল জি ও গ্রাফি এবং ডিসকভারী চ্যানেলের অভিযান সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছিঃ-

ন্যাশনাল জি ও গ্রাফি এর অভিযানঃ

ন্যাশনাল জি ও গ্রাফি সোসাইটির পক্ষ থেকে একটি অনুসন্ধানকারী দল ১৯৮৫ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর তলদেশে খুঁজে পায় টাইটানিকের রাজকীয় অথচ করুন ধ্বংসাবশেষ ।

তারা দেখতে পান যে টাইটানিক এর সামনের অংশ থেকে পেছনের অংশ প্রায় ১৯৭০ ফুট দূরে পৃথকভাবে পলি ও কাদায় প্রোথিত হয়ে পড়ে আছে। এই অভিযানে টাইটানিক ধ্বংসাবশেষের প্রায় ৭০,০০০ হাজার ছবি তোলা হয়।

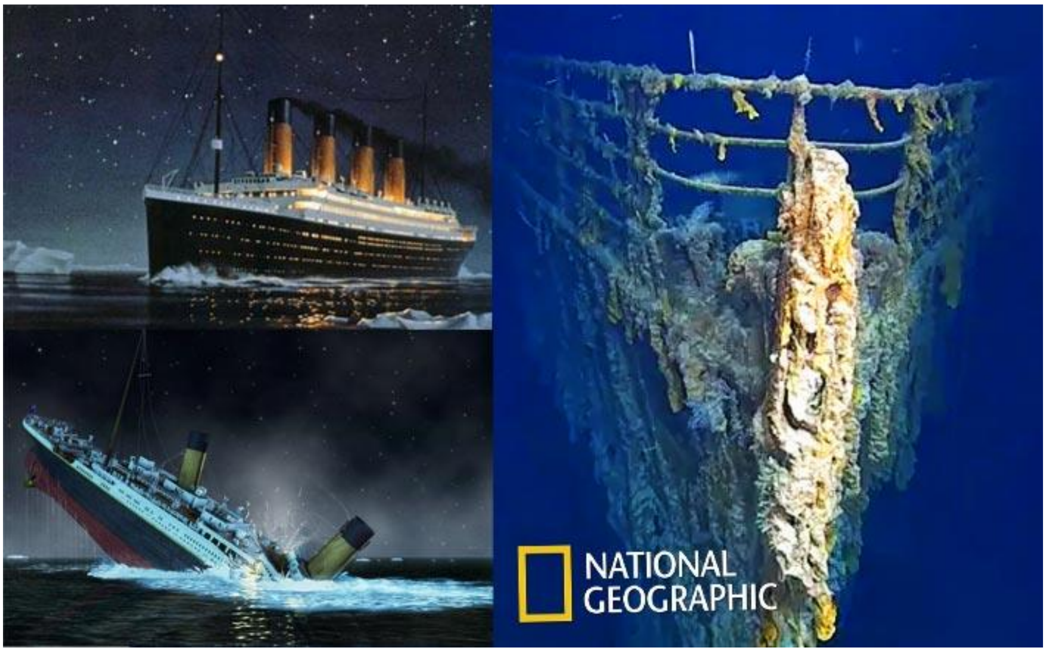

এই অভিযানে অ্যাল্ভিন নামক একটি ছোট্ট সাবমারসিবল আর তার বডির সাথে সংযুক্ত জ্যাসন জুনিয়র নামে একটি মিনিয়েচার রোবট জাহাজটির ধ্বংসাবশেষের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ক্যামেরা ও শক্তিশালী আলোযুক্ত এই যন্ত্রদুটি ছাড়াও অ্যাঙ্কাস নামক অপর একটি ক্যামেরাও ব্যাবহার করা হয়। তবে যন্ত্র তিনটির সাহায্যে যে ছবিগুলি নেয়া হয় তা সবই স্থিরচিত্র। এই ছবিগুলো থেকে টাইটানিক এর ধ্বংসাবশেষের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

ডিসকভারি চ্যানেলের অভিযানঃ

ডিসকভারী চ্যানেল ও এন বি সি ডেটলাইন এর যৌথ প্রচেস্টায় আয়োজিত হয় টাইটানিক এক্সপেডিশন বা টাইটানিক অভিযান। আর সবথেকে অভিনব ব্যাপারটি হলো এই যে অনুষ্ঠানটি টিভিতে ১০০ টির ও বেশী দেশে ডিসকভারি চ্যানেল এর মাধ্যোমে লাইভ দেখানো হয়।

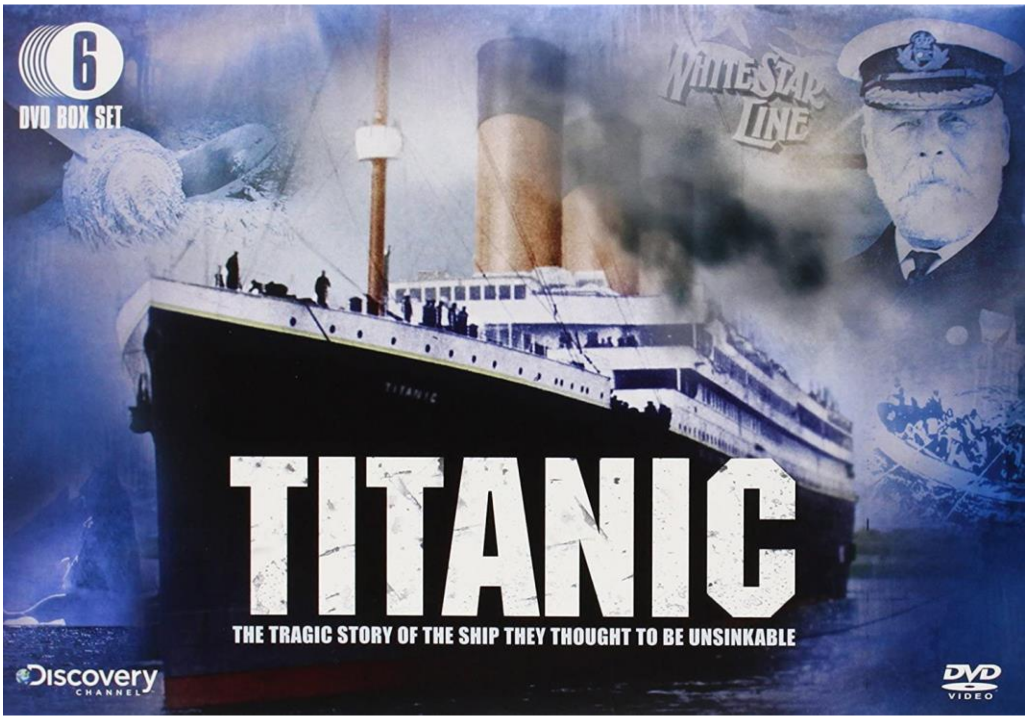

বৈজ্ঞানিক , ঐতিহাসিক ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় মিলিত প্রচেষ্টায় সংগঠিত দুই ঘন্টার এই অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিলো ব্যাপক। Ocean Voyager নামক এক জাহাজকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো টাইটানিকের ডুবে যাওয়া স্থানটিতে। জাহাজটি থেকে ম্যাজেলান নামক এক সাবমারসিবল কে নামানো হয় সমুদ্রের পানিতে। এছাড়া আটলান্টিকে নামানো হয় নটিলে নামক এক ফরাসি সাবমেরিন কে।

টাইটানিক এর ধ্বংসাবশেষ এর উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ানো নটিলের ভেতর ছিলেন পল মেথিজ ও তার দুই সহকারী। এই সাবমেরিনটির সাথে ফাইবার কেবল এর সাহায্যে যুক্ত ছিলো রবিন নামের একটি ক্যামেরা যুক্ত যন্ত্র। আকারে ছোট হওয়ায় টাইটানিকের ভেতরে একে ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব হয়।

এই তিন সাবমেরিন এর ক্যামেরা দিয়ে টাইটানিকের তিন রকম ভিডিও গ্রাফি এসেছিলো। রবিন এর ক্যামেরা দিয়ে এসেছিলো টাইটানিক এর ভেতর দিক এবং ম্যাজেলান ও নটিলের ক্যামেরা দিয়া এসেছিলো টাইটানিকের বাইরের দিক।

পর্বঃ১৪

টাইটানিক চলচিত্র ১৯৯৭ এর কথা

(TITANIC Cinema 1997 Description)

টাইটানিক সিনেমাটি ১৯৯৭ সালে মুক্তি পায় । যা এই শতাব্দীর সব থেকে ব্যায়বহুল ও বানিজ্যিক দিক দিয়ে সব চেয়ে সফল ছবি। ছবিটি তৈরি করতে খরচ হয় ২০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৭৭৬ কোটি টাকা। যা কিনা সত্যিকারের টাইটানিক জাহাজের দামের থেকে বেশী। পরিচালক জেমস ক্যামেরন বিস্তর গবেষণা করে যখন এই ছবির কাজে হাত দেন তখন সমস্ত ঐতিহাসিক টাইটানিক- এর তুলনায় কোনো অংশে কম ছিলো না।

১৯৯৪ সালে ট্রু লাইস ছবি করার পর জেমস ক্যামেরন টাইটানিক ছবি করার সিদ্ধান্ত নেন।বস্তুত তার উদ্দোগ ও দক্ষতার ফলে সৃষ্টি হয় এযুগের অন্যোতম শ্রেষ্ঠ এপিক চলচিত্র " টাইটানিক" । ১৯৯৫ সালে ছবির কাজে হাত দিলেও টাইটানিক এর ইতিহাস জেমস ক্যামেরন কে সেই ছোটবেলা থেকেই নাড়া দিতো। ছোটবেলায় ইতিহাস পড়তে অনেক ভালোবাসতেন তিনি । আর টাইটানিক এর মর্মান্তিক পরিণতি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো তার মধ্যে। সাংবাদিকদের জেমস ক্যামেরন জানিয়েছিলেন যে ছোটবেলার এক বড় অংশ তার কেটেছে টাইটানিক নিয়ে গবেষণা করে।

সেই সময় টাইটানিকের চিন্তা মিশে গিয়েছিলো তার সমস্ত সত্ত্বার সঙ্গে। এরপর ঘটনাচক্রে তিনি টাইটানিক ছবি তৈরির কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৮৫ সালে রয় ওয়ার্ড বেকার পরিচালিত " এ নাইট টু রিমেম্বার" ছবিটি জেমস ক্যামেরন বহুবার দেখেন। আর তিনি খোলাখুলি জানিয়েছেন যে টাইটানিক তৈরির ক্ষেত্রে এ ছবি তাকে বিশেষভাবে অনুপ্রানিত করে। এছাড়া ১৯৮৫ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি এর উদ্দোগে একটি অনুসন্ধানী দল আটলান্টিক মহাসাগরের তলায় মেইল খানেক এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টাইটানিকের ভগ্নাবশেষ এর মোট ৭০,০০০ ছবি তুলে আনে। এই ছবিগুলোও জেমস ক্যামেরনকে তার ছবি তৈরির জন্যে বিশেষভাবে অনুপ্রানিত করে।

এরপর জেমস ক্যামেরন বহু বইপত্র ঘেটে টাইটানিক সম্পর্কে নানান তথ্যের পাহাড় সংগ্রহ করেন। আলোচনা করেন বহু নৌবিদ ও সমুদ্র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। টাইটানিক নিয়ে তৈরি হওয়া বহু ডকুমেন্টারি তিনি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেন। চার পাচ বছর ধরে টাইটানিক নিয়ে নিরলসভাবে হোমওয়ার্ক করার পর তিনি মূল ছবি তৈরির কাজে হাত দেন।

কিন্তু ছবি বানানোর আগে বহু বছরের স্বপ্নের জাহাজকে নিজ চোখে দেখার জন্যে ব্যাস্ত হয়ে পড়েন। প্রযোজক সংস্থা " টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরী ফক্স" ও " প্যারামাউণ্ট পিকচারস" ক্যামেরনের কথায় রাজি হয়ে যান। তাদেরই উদ্দোগে আটলান্টিক মহাসাগরের আড়াই মেইল গভীরে পলি ও শ্যাওলায় ঘেরা টাইটানিকের করুন ধ্বংসাবশেষ দেখে আসেন জেমস ক্যামেরন। সঙ্গে ছিলেন তার ভাই মাউক ক্যামেরন। রাশিয়ান রিসার্চ ভেসেল অ্যাকাডেমিক মান্তিস্লাভ কেলডিস থেকে পাঠানো "মির-১" নামক একটি ছোট সাবমারসিবল এ করে তারা ঘুরে আসেন আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর তলদেশে।

জেমস ক্যামেরন আগাগোড়াই বিগ বাজেটের ছবি করতে অভ্যাস্ত এবং টাইটানিকের মতো এই ঐতিহাসিক বিষয়ে ছবি তৈরি করতে গিয়ে তিনি টাকা খরচ করেন পানির মতো। তিনি মনে করেন টাকার কার্পণ্য বা কোনোরকম ফাঁকিজুঁকি হয়তো দর্শকদের বিশ্বাস ভঙ্গ করবে। আর যেকোনো ঐতিহাসিক ছবিতেই ইতিহাসকে ভালোকরে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যোমে ছবির গুনমান ফুটে উঠে। টাইটানিক করতে গিয়ে এইসব দিক বিশেষভাবে নজরে রাখেন জেমস ক্যামেরন। তাই টাইটানিক ছবির তৈরির খরচ ছাড়িয়ে যায় হলিউডের সমস্ত ছবির খরচের রেকর্ডকে ।

উল্লেখ করা হলো যে টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরী ফক্সের মতো প্রযোজক সংস্থাও ক্যামেরনের খরচ্র বহর দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো। প্রথমদিকে তারা তাকে নির্বৃত্ত করার চেষ্টা করেও নিরাশ হয়। ইংরেজ চিত্রসাংবাদিক ছবির শুটিং এর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর আগে তিনি কোনো ছবিতে এইরকম পানির মতো টাকা খরচ হতে দেখেননি। তাঁর কথামতো- " পানি নিয়ে ছবি ,পানির মতো টাকা খরচ হবেই ।" হলিউডে নয় মেক্সিকোর রোজারিটো সমুদ্র সৈকতে প্রায় ১২০ বিঘা জমি নিয়ে "ফক্স বাজা" স্টূডিওতে টাইটানিক এর শুটিং করা হয়। সেখানে বিশাল এক গর্ত খুড়ে ঢালা হয় ১ কোটি ৭০ গ্যালন সাগরের জল। এই বিশাল ট্যাঙ্কটা আগে থেকেই ইস্পাতের পাত দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়েছিলো। এবং তৈরি করা হয়েছিলো রিমোট কন্ট্রোল সমুদ্রের ঢেউ।

ছবির শুরুতে আমরা যে টাইটানিকের পানির তলায় যে অভিযানটা দেখি তা শুটিং করা হয় এই নকল সমুদ্রে। সামুদ্রিক শ্যাওলা ধরা টাইটানিক জাহাজের যে ভগ্নাবশেষ দেখানো হয় তাও আলাদা করে বানানো হয়। এরই আনাচে কানাচে উকি মারে রিমোট অপারেটিং ভেহিকল। টাইটানিক ছবির জন্যে আসল টাইটানিকের আদলে তৈরি করা হয়েছিলো যে জাহাজটি তা ছিলো ২৩৫ মিটার লম্বা। এই মডেলটি আসল টাইটানিক থেকে ১০ শতাংশ কম ছিলো। তবে এটি ছিলো জাহাজের বাইরের অংশ। ভেতরের শুটিং আলাদা আলাদা স্টূডিওতে করা হয়েছিলো।

১৯৯৬ সালের ৩১ মে মেক্সিকোর সমুদ্র সৈকতে শুরু হয় ফক্স বাজা স্টূডিও তৈরির কাজ, ৮৪ বছর আগে একইদিনে বেলফাস্ট থেকে হারল্যাণ্ড অ্যাণ্ড উলফ থেকে টাইটানিকের খোল ভাসানো হয়েছিলো।এই স্টূডিওকে ১০০ দিনের স্টূডিও বলা হতো।সাউদাম্পটন বন্দর সংলগ্ন টাইটানিক জাহাজটির গোটা সেটটা নিয়ে তৈরি হয় এই স্টূডিও। টাইটানিকের যাত্রার শুটিং তোলার দিন এই স্টূডিওতে জড়ো হয়েছিলো ১০০০ জুনিওর আর্টিস্ট , ২৫ টি ঘোড়া , একডজন ভিনটেজ গাড়ী। এই গোটা সেটটা চলচিত্রের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত তৈরি সবচেয়ে বড় সেট।

টাইটানিক এর অফিসারদের কথা

(TITANIC's Officers Voice)

১৯১২ সালের টাইটানিক ট্রাযেডি থেকে বেঁচে ফিরে আসা দুইজন অফিসারদের কথা বলবো এখন। যারা টাইটানিক এর লাইফবোটে কিংবা টাইটানিক ডুবে যাওয়ার পর পানি থেকে জীবন্ত উদ্ধার হয়েছিলেন।কিন্তু অন্যেরা টাইটানিকের সেই মর্মান্তিক ডুবে যাওয়ার ঘটনা বলতে চান নি কিন্তু এই দুজন অফিসার সেই বিভীষিকাময় রাতের কথা বলেন পুরো বিশ্বকে। এখানে তাদের যে বক্তব্যো দেয়া হয়েছে তা ডিসকভারী চ্যানেলের ইন্টারভিউ তে তারা দিয়েছিলেন।

সেকেন্ড অফিসার চার্লস লাইটহোলারঃ "Frankly I am in the Middle position in the Titanic.I see Titanics foxel down in the cold,dark water.Some of the lights were shining Down on the underwater part.I am not ready to submerge.I werenot be to able gustly transparency."

"ভাগ্যোক্রমে আমি টাইটানিকের মধ্যের অংশে ছিলাম। আমি দেখছিলাম টাইটানিকের ফক্সেল অন্ধকার ,ঠান্ডা, কালো পানিতে ডুবে যাচ্ছে।কিছু কিছু আলো তখনও জ্বলছিলো ডুবে যাওয়া টাইটানিকের অংশে। কিন্তু আমি তলিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। চোখের সামনে আমি অস্বচ্ছ কুয়াশা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।"

ফোরথ অফিসার লিওনার্দো বক্সহলঃ "I was both half between the officers quarters.I was play duty in there officers quarters in the breech.When the crash came she was doing full speed and week to brake can stand. She strucked on port side . firstly she crashed in officers bunkers"

"আমি অফিসারস কোয়াটারস এর মধ্যেই ছিলাম। আমি ব্রিজ অফিসারস কোয়াটারস এর জায়গায় ডিউটি পালন করছিলাম।যখন সংঘর্ষ হলো তখন এটি সর্বোচ্চ গতিতে চলছিলো এবং সেখানে ব্রেক বলতে কিছুই ছিলো না। এটি পোর্ট সাইডে সংঘর্ষ ঘটায়। প্রথমে অফিসারস বাঙ্কারস এ সংঘর্ষ হয়"।

পর্বঃ১৬

টাইটানিক এর আগাম ভবিষ্যৎবাণী

(Infailable Prediction of TITANIC)

১৯১২ সালের ডুবে যাওয়া টাইটানিক এর ঘটনা অনেক আগেই লিখে রেখেছিলেন এক লেখক। সেটা টাইটানিকের ডুবে যাওয়ার আগে নয় বরং টাইটানিক নামের এই অতিকায় জাহাজটি জন্মের আগেও।

কি বিশ্বাস হচ্ছে না??!! আসলে এই ঘটনাটি তে সম্পূর্ণ বিশ্ব হকচকিয়ে যায়। কারন ১৯০৫ সালে মরগান রবার্টসন নামের এক লেখক টাইটানিকের ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন টাইটানিক জন্মের আগেই। বইটির নাম " Futility or The Wreck of The Titan".

রবারটসন বইটিতে উল্লেখ করেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ যেটা কিনা সাউদাম্পটন হতে নিউইয়র্ক যাওয়ার জন্যে সমুদ্রে ভেসেছিলো। এটা ছিলো আনসিঙ্কেবল।প্রায় ১২০০ মানুষ নিয়ে নিজের প্রথম যাত্রায় আটলান্টিকে এক অতিকায় বরফখণ্ডো এর ধাক্কায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ডুবে যায়।

তিনি তার বইতে যে জাহাজের কথা বলেন তার সাথে আসল টাইটানিক ডুবে যাওয়ার ঘটনা পুরোপুরিভাবে মিলে যায়। কিন্তু কয়েকটি ঘটনা মেলে না । সেগুলো হচ্ছে বইতে তিনি যে জাহাজের কথা বলেছেন সেটার দৈর্ঘ্য ছিলো ৬৭৯ ফিট। যেখানে আসল টাইটানিকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৮৮২ ফিট।

এবং যাত্রীসংখ্যা সর্বমোট বলা হয়েছিলো ১২০০ কিন্তু আসল টাইটানিকে ২২০০ এর কাছাকাছি ছিলো। বইতে উল্লেখ করা জাহাজটি ডুবে যাওয়ার পর ৮০০ জনের মৃত্যু হয় যেখানে আসল টাইটানিকে ১৫০০ জন মৃত্যুবরণ করেছিলো।

এইরকম খুটি নাটি কয়েকটি কারন ছাড়া আসল টাইটানিকের ট্রাযেডির সাথে এই বইয়ের কথা সম্পূর্ণ কাকতালীয় ভাবে মিলে যায়।

পর্বঃ১৭

আবার টাইটানিক! আবার স্বপ্ন

(Again Titanic!! Again Dreams)

১৯১২ সালের ডুবে যাওয়া টাইটানিক পানিতে ভাসবে আবারো এমনটাই জানিয়েছে আমেরিকার এক ধনকুবের ।তার অধীনে পরিচালিত “Blue Star Line ” এর ডক থেকেই জন্ম নেবে ১৯১২ সালের ডুবে যাওয়া টাইটানিকের আদলেই তৈরি করা আরেকটি জাহাজ। যার নাম দেয়া হবে “টাইটানিক-২"।

আধুনিক এই টাইটানিকের খরচের খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৭০ লক্ষ পাউণ্ড। বিলাস, বৈভব, আভিজাত্যের দিক দিয়ে ও ঐতিহ্যের দিক মিলিয়ে জাহাজটিতে রাখা হয়েছে হাইটেক ইঞ্জিন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যাবস্থা , স্যাটেলাইট টেলিভিশন , অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যাবস্থা ও আধুনিক বিনোদনের সমস্ত উপকরন। এই টাইটানিকে থাকবে ২৫০০ যাত্রীর সুব্যাবস্থা এবং জাহাজকর্মী থাকবে ৬০০ এর মতো।

তবে শুধু যাত্রাই নয় যাত্রাপথে একটি অভিনব ব্যাপার করারও পরিকল্পনা নিয়েছেন জাহাজটির মালিকপক্ষ। টাইটানিক ২ সেইখানেই পৌঁছাবে যেখানে শুয়ে আছে ১৯১২ সালের ডুবে যাওয়া টাইটানিকের ভগ্নাবশেষ। এবং রাত ১১ টা ৪০ মিনিটে হিমশৈলের সাথে ধাক্কা লেগে টাইটানিক এর আর ২ টা ২০ মিনিটে জাহাজটির পানিতে নিমজ্জনের সাথে সলীল সমাধী ঘটে ১৫১৩ জন যাত্রীর।

মৃত এই যাত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে টাইটানিক ২ থেকে বর্ষশেষের এই রাতটিতে ১৫২৩টি মোমবাতি জ্বালিয়ে পানিতে ভাসানো হবে; এছাড়াও ভাসানো হবে পুষ্পস্তবক। গোটা অনুষ্ঠানই সারা বিশ্ববাসী দেখতে পাবেন টিভির পর্দায় ।

নতুন শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার প্রতি শোকজ্ঞাপনের এটাই হয়তো শ্রেষ্ঠ উপায়। আধুনিক টাইটানিক পানিতে ভেসে চলুক, ভাসিয়ে নিয়ে চলুক শতাধীক মানুষ আর তাদের স্বপ্নকে এটাই বিশ্ববাসীর চাওয়া ।নিয়তির নিষ্ঠুর অভিশাপ যেন কখোনোই এই জাহাজকে গ্রাস করতে না পারে।

পর্বঃ১৮

টাইটানিক সম্পর্কে আরো অজানা কথা

(TITANIC's Exta Unknown Information)

টাইটানিক সম্পর্কে বর্তমান সময়ে জানে না এমন কাউকেই খুঁজে পাওয়াটাই বেশ মুশকিল। কিন্তু টাইটানিক এর সাথে জড়িত এমন আরো অনেক তথ্যের কথা আছে যা আমাদের আজো অজানা। কিছু হয়তো আমরা জানি। কিন্তু এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো আমাদের চক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে এখনও

- টাইটানিক এ কর্মরত একজন জাপানি বেঁচে যান এই দুর্ঘটনা থেকে। এরপর যখন তিনি জিন দেশ জাপানে ফিরে যান তাঁর স্বদেশিরা তাকে ধিক্কার জানান যে সে টাইটানিকের সাথে ডুবে যায় নি কেন?
- টাইটানিক চলচিত্রের হৃদয় স্পর্শকারী এক দৃশ্য ছিলো টাইটানিক ডোবার সময় বাদকযন্ত্র বাদকেরা তাদের বাদ্যোযন্ত্র বাজাচ্ছিলো। সত্যি সত্যি এমনটি আসল টাইটানিকে ঘটেছিলো।
- বরফের সাথে সংঘর্ষের ৩০ সেকেণ্ড পূর্বে তারা এটি দেখতে পান। এবং তাৎক্ষণিক ব্যাবস্থা নিলে এই সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব ছিলো।
- **Milton Hershay** যে কিনা বিশ্ববিখ্যাত চকলেট নির্মাতা কোম্পানি **The Hershays Company** এর প্রতিষ্ঠাতা । তার হাত ধরেই নানা রকম স্বাদের চকলেট এসেছে বাজারে। টাইটানিকে যাত্রার জন্যে তিনি টিকেট কিনেছিলেন ঠিকই কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে তিনি যাত্রা বাতিল করেন।
- টাইটানিকের ৪টি ধোয়া বের হবার চিমনির ৮ নম্বর টি জাহাজের সৌন্দর্যের বৃদ্ধি করার জন্যে লাগানো হয়েছিলো।
- টাইটানিকের অর্ধেকের বেশী লাইফবোটে সেটার ধারনক্ষমতার চেয়ে কম যাত্রী ছিলো।
- টাইটানিক ইতিহাসের একমাত্র জাহাজ যেটা কিনা বরফের সাথে ধাক্কা লাগার ফলে ডুবে যায়।
- টাইটানিকের যাত্রার পূর্বের দিন জাহাজ কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হলে যাত্রী ও অফিসারদের অবস্থা কেমন হবে সেটা নিয়ে একটা ট্রেনিং এর আয়োজন করার কথা ছিলো। কিন্তু অজানা কোনো কারনে সেটা বাতিল করা হয়।
- টাইটানিক যে বরফের সাথে ধাক্কা লেগেছিলো সেটা খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ বছর আগে থেকে পানিতে ভেসেছিলো
- টাইটানিক ডোবার পরে পানিতে ভাসমান অবস্থায় যাদের উদ্ধার করা হয় তাদের মধ্যে অন্যোতম হলেন টাইটানিকের প্রধান রাধক।যদিও প্রচণ্ড ঠান্ডায় তাঁর চারপাশের সকলে মারা গিয়েছিলো কিন্তু সে জাহাজ ডোবার পূর্ব পর্যন্ত যে পরিমান অ্যালকোহল পান করেছিলেন সেটা তাকে ঠান্ডা পানিতে উষ্ণ রাখতে সহায়তা করেছিলো।

পর্বঃ১৯

টাইটানিক চলচিত্রের গান

(Song Of TITANIC Cinema)

সঙ্গীতঃ জেমস হর্নার
কথাঃ উইল জেনিংস
কন্ঠঃ সেলেনা ডিওন
পরিচালনায়ঃ জেমস ক্যামেরন
অ্যালবামঃ **LETS TALK ABOUT LOVE**

Every night in my dreams
I see you, I feel you
That is how I know you go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more, you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go 'til we're gone

Love was when I loved you
One true time I'd hold to
In my life, we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more, you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

You're here, there's nothing I fear
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart and
My heart will go on and on

পর্বঃ২০

টাইটানিক এর পিকচার স্টাডি

(Picture Study of The TITANIC)

সাউদাম্পটন বন্দর থেকে টাইটানিক

কুইন্সটাউন বন্দর থেকে টাইটানিক

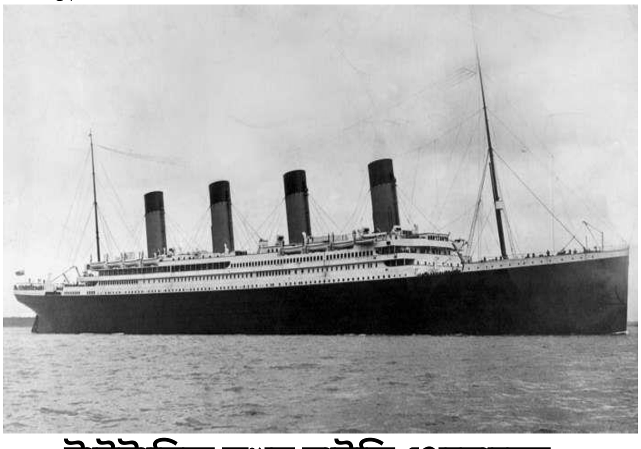

টাইটানিক যখন হাইতি পেরোচ্ছে

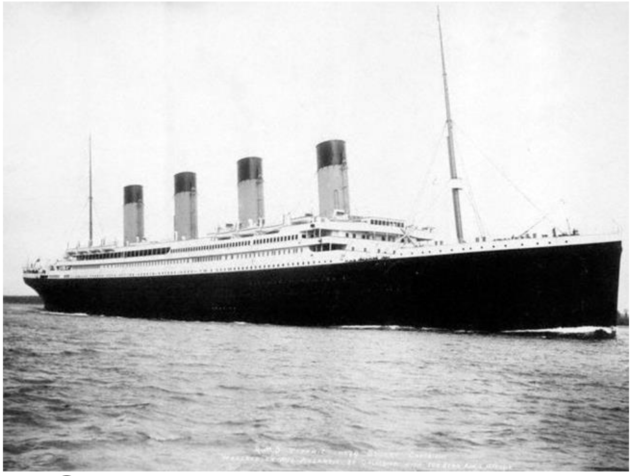

টাইটানিকের যখন আইলস অফ রাইট পেরোচ্ছে

টাইটানিকের ১ম শ্রেণীর ডিনার সেলুন

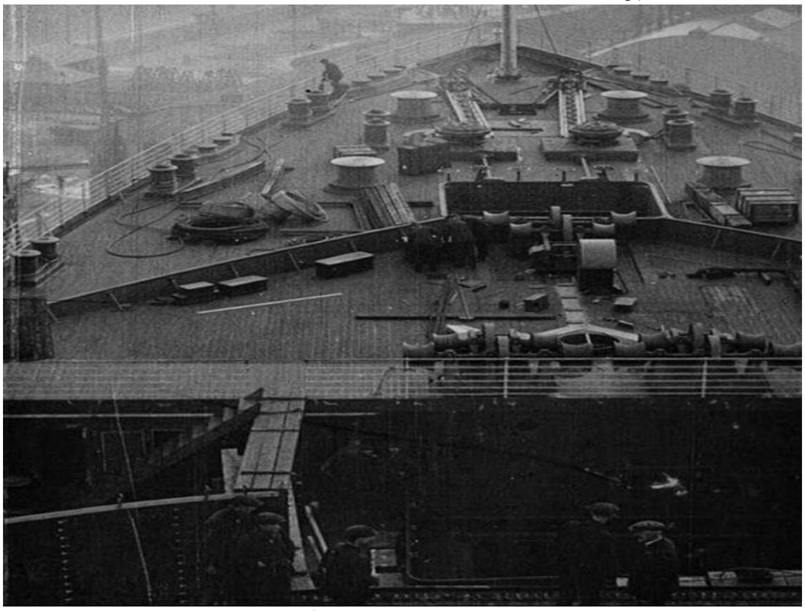

টাইটানিকের বো সাইড

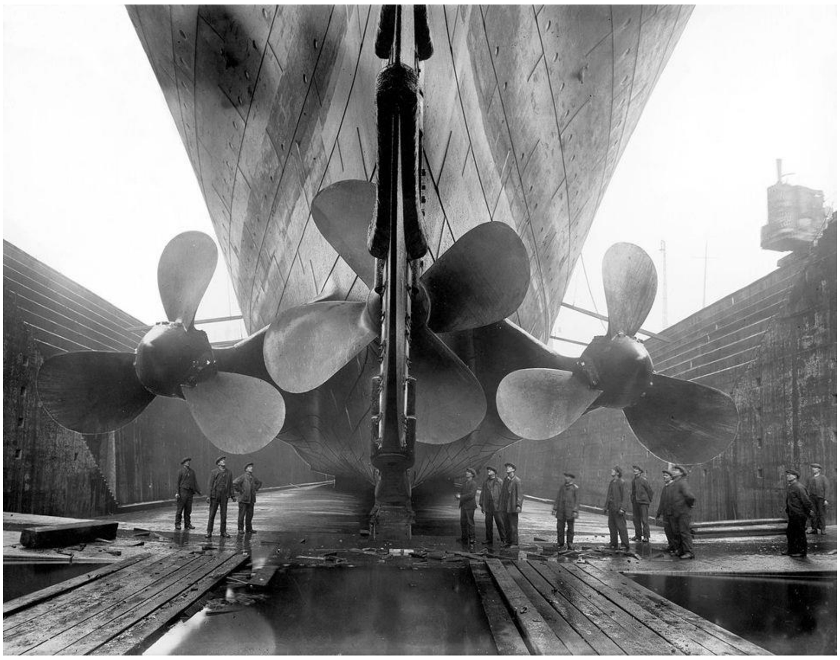

টাইটানিকের প্রপেলার

রেডিও অফিসার জ্যাক ফিলিপ্স

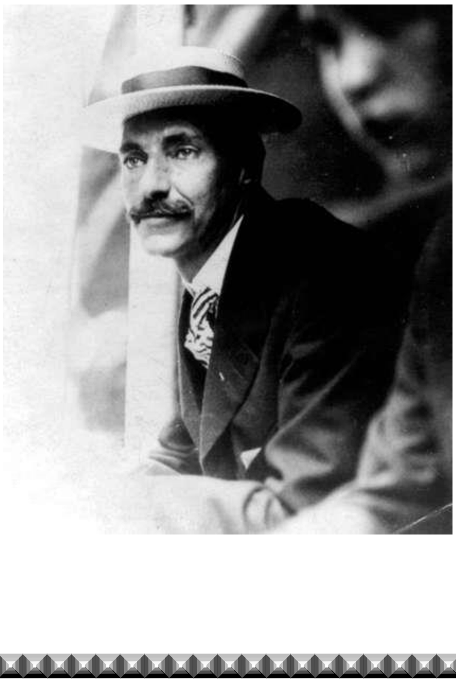

জন জ্যাকব অ্যাস্টর

মলি ব্রাউন

ক্যাপ্টেন জন অ্যাডওয়ার্ড স্মিথ

পানির তলায় টাইটানিকের বো সাইড

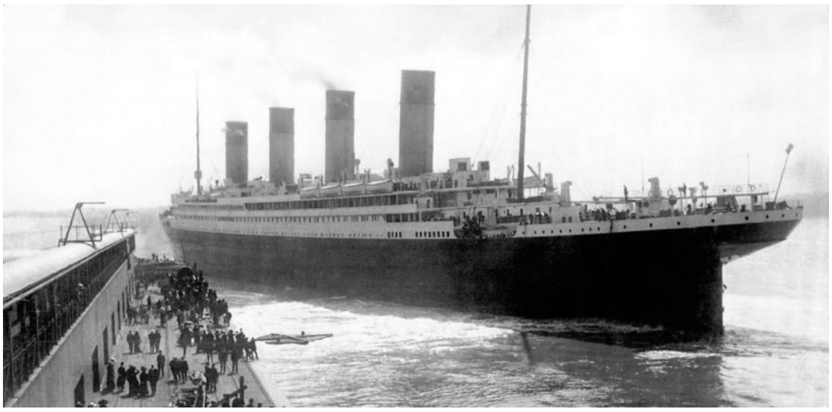

টাইটানিক যখন আমেরিকার পথে

টাইটানিকের ফার্স্ট ক্লাস স্মোকিং রুম

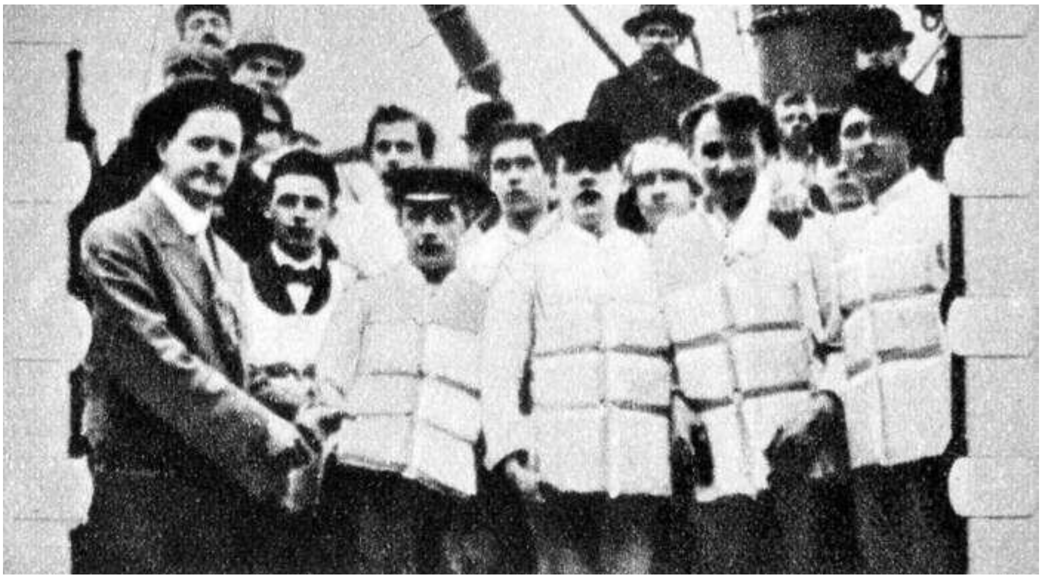

টাইটানিকের লাইফ জ্যাকেট মহড়া অনুষ্ঠান

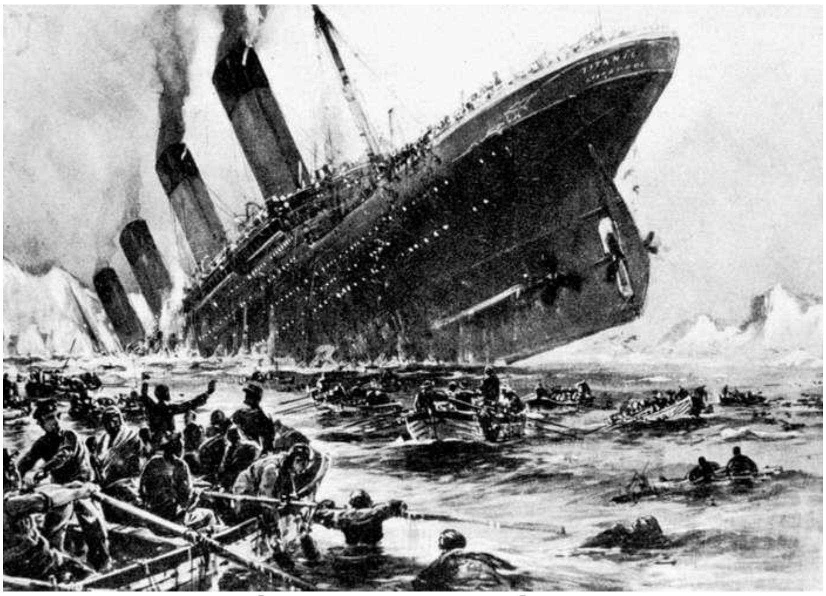

টাইটানিক যখন ডুবে যাচ্ছিলো

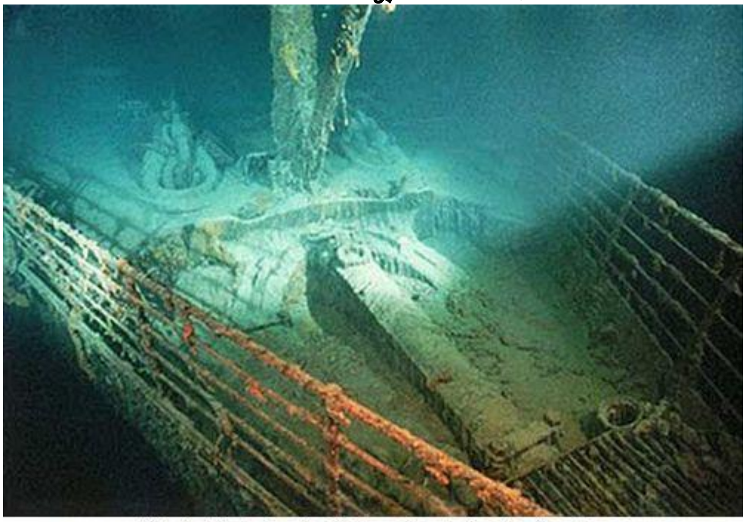

Historical photo of sunken Titanic underwater is real and amazing.

ডুবে যাওয়া টাইটানিকের ফক্সেল অ্যাংকর

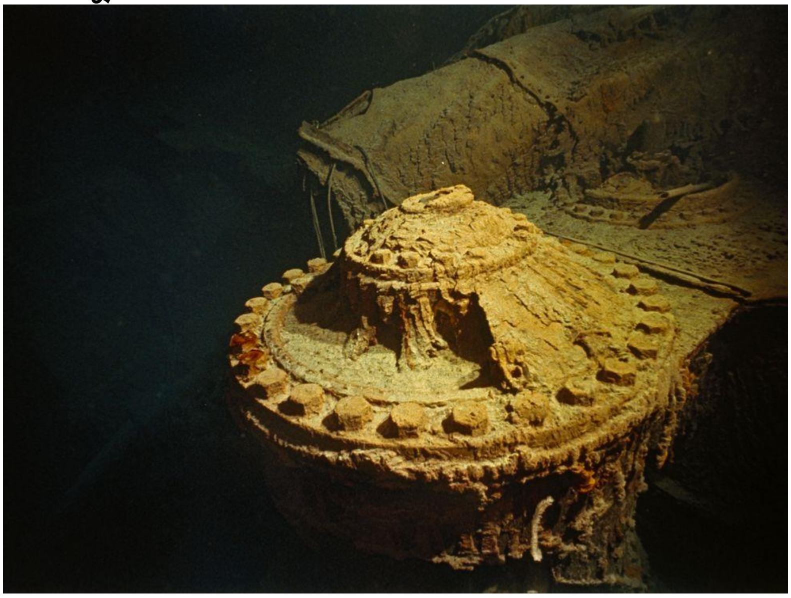

টাইটানিকের লাইফবোট ক্যাপ্সটান

টাইটানিকের লাইফবোটগুলি

টাইটানিকের লাইফবোট যখন কারপাথিয়াতে তোলা হচ্ছিলো

টাইটানিক থেকে বেঁচে ফেরাদের একাংশ

লাইফবোটে টাইটানিকের যাত্রীগন

পানির নিচের টাইটানিকের ফার্স্ট ক্লাস স্টেয়ারকেজ

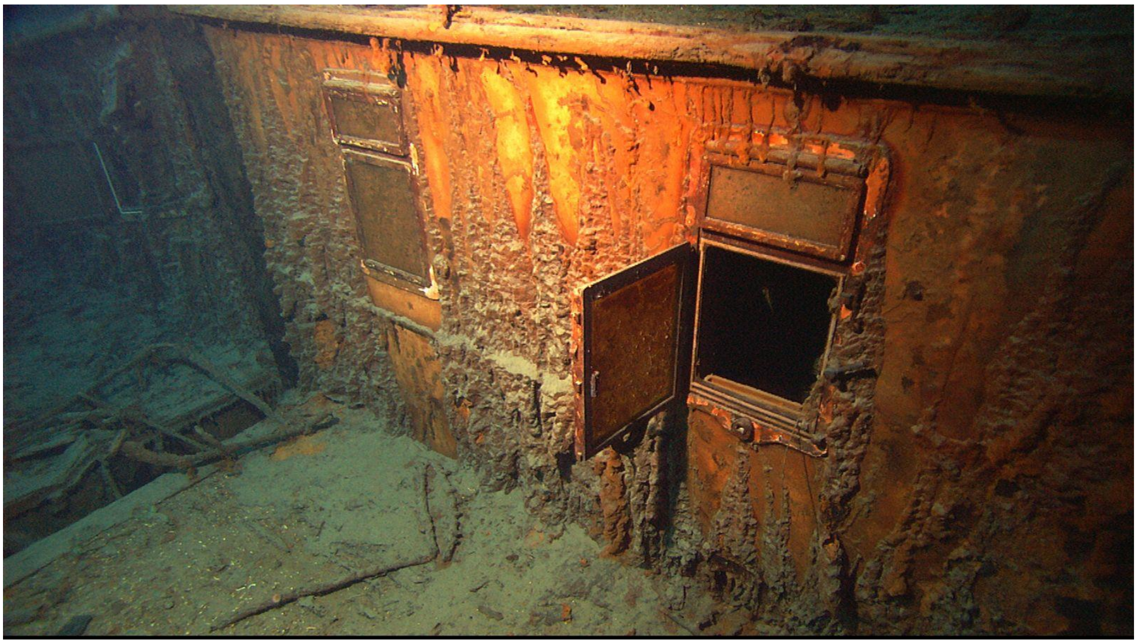

টাইটানিকের অফিসারস কোয়াটার

টাইটানিকের উপরে পাওয়া কিছু জিনিসপত্র

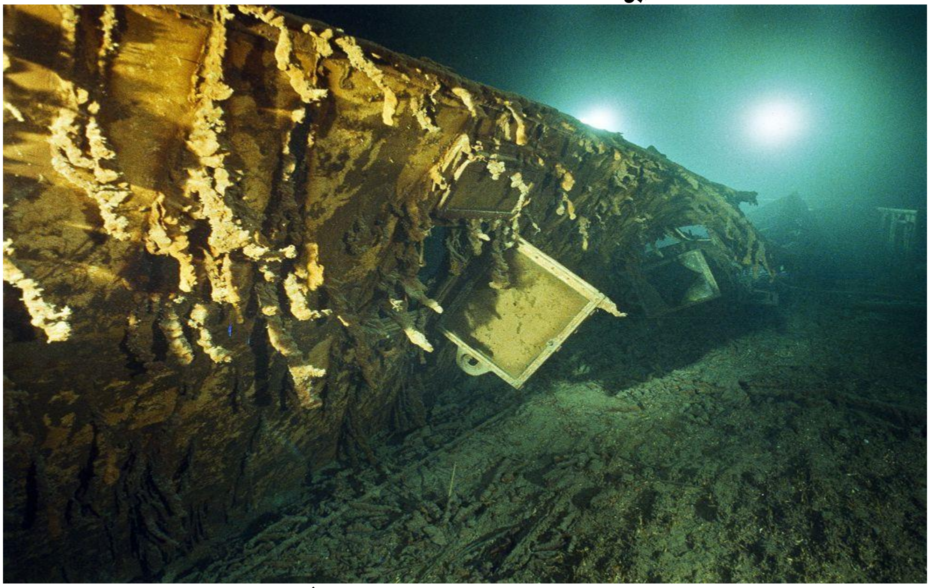
ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেজওয়ে

টাইটানিকের ফক্সেল

টাইটানিকের গ্রাউণ্ড হ্যাচকমিং

টাইটানিকের ক্যাপস্টান

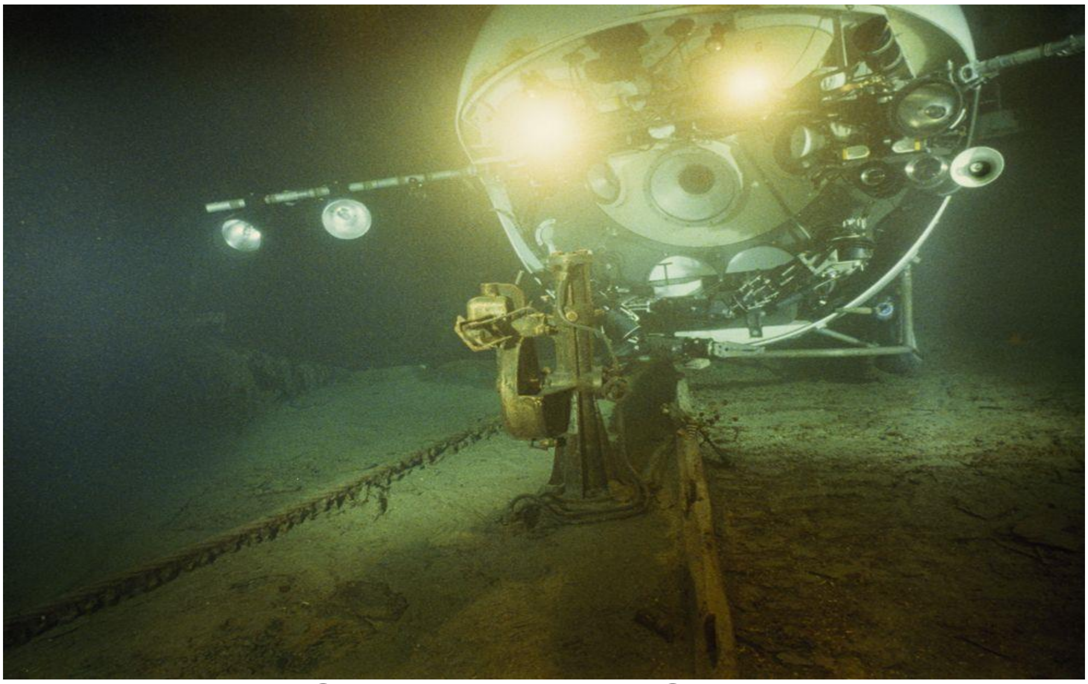

সাবমারসিবল থেকে দেখা টাইটানিকের হুইল হ্যাং

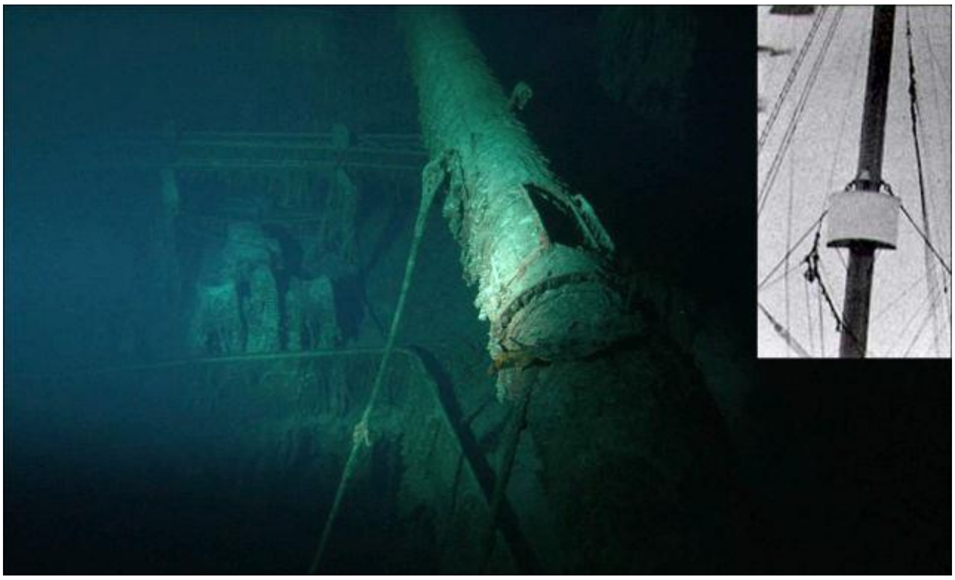

টাইটানিকের ওয়াচ টাওয়ার (ক্রো নেষ্ট)

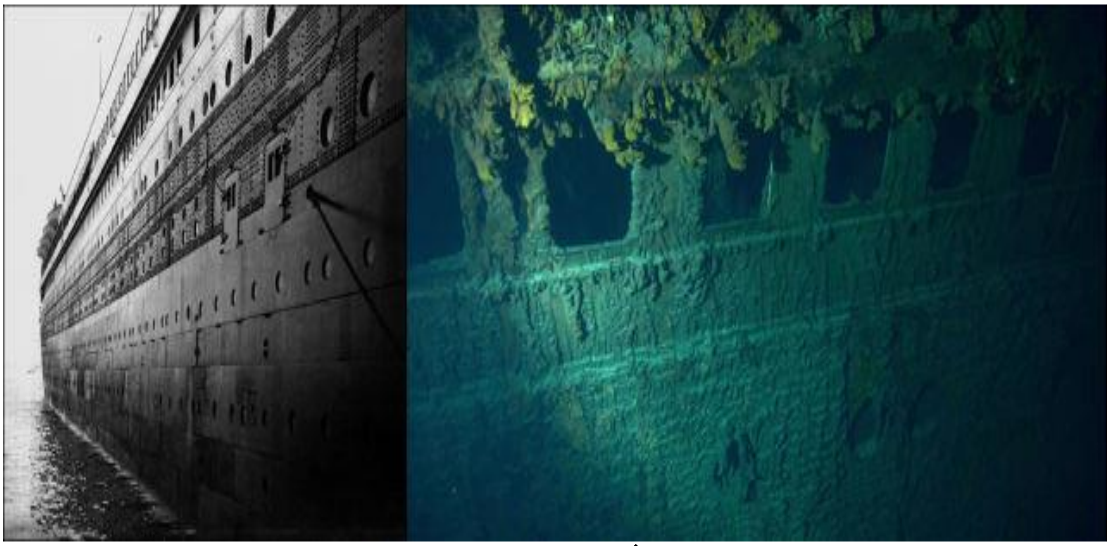

টাইটানিকের পোর্ট সাইড

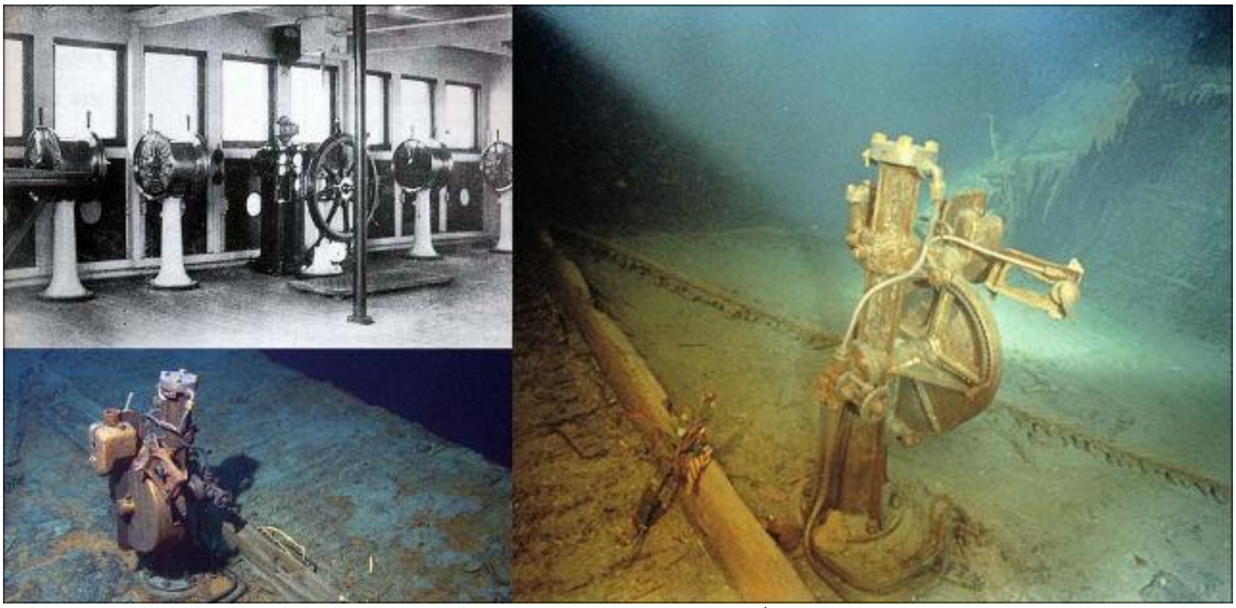

টাইটানিকের হুইল হাউজ এর বর্তমান অবস্থা

টাইটানিকের গ্রাণ্ড স্টেয়ারকেজ

ফার্স্ট ক্লাস ডাইনিং সেলুন পিলার

টাইটানিকের ডিজাইনার টমাস অ্যাণ্ড্রেউস এর কেবিনের ঝাড়বাতি

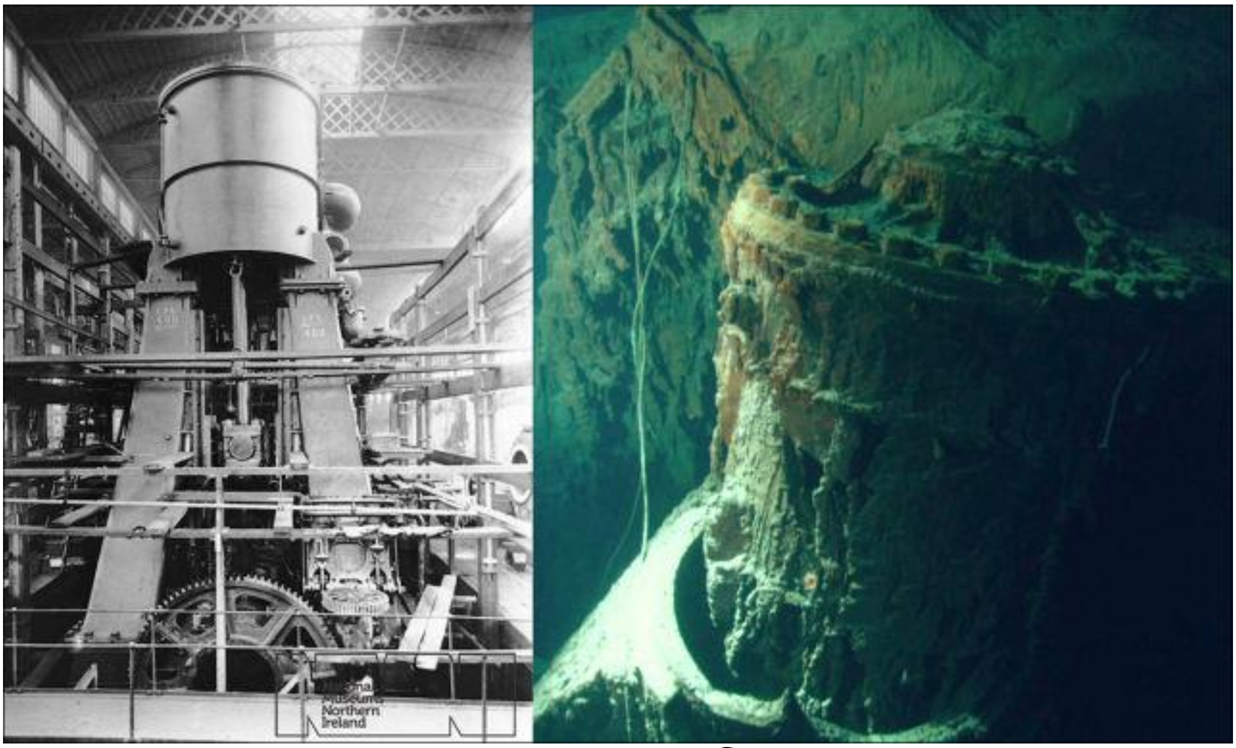

টাইটানিকের রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন

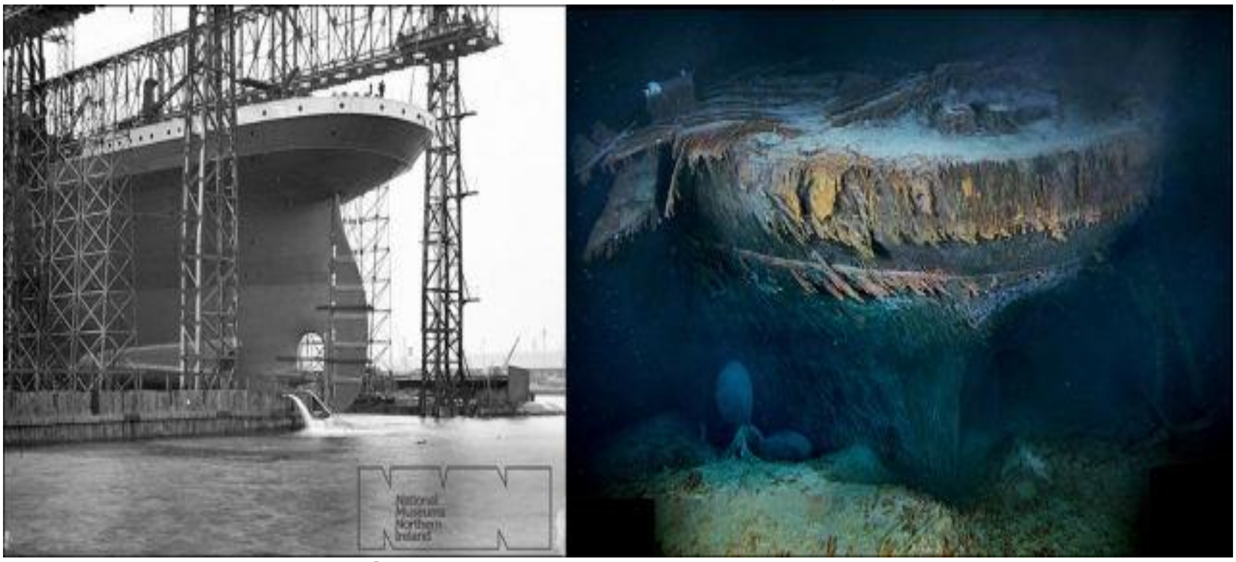

টাইটানিকের স্টারন সাইড বা পেছনের অংশ

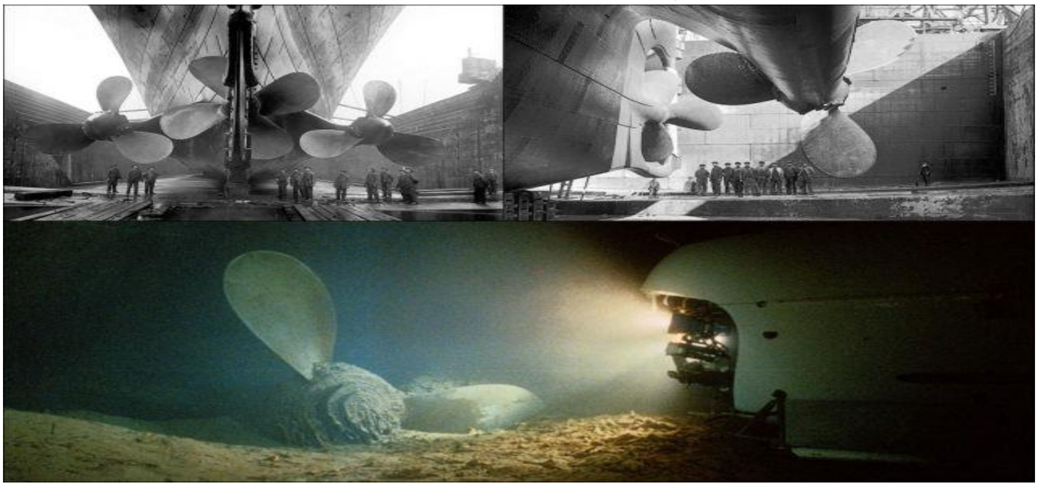

টাইটানিকের আন্ডার ওয়াটার প্রপেলার

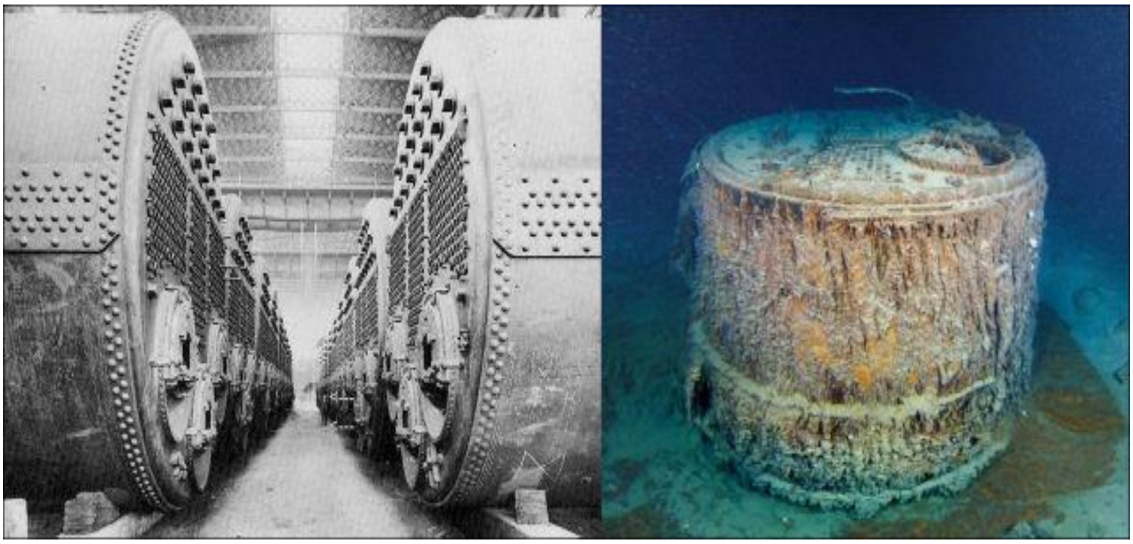

টাইটানিকের বয়লার

টাইটানিকের স্টারন ডেক

টাইটানিকের হ্যালোজেন ডেক চেয়ার

পর্বঃ২১

টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে আলোচনা

(Discuss about the wreck of the TITANIC)

১৯১২ সালের মর্মান্তিক রাতের ডুবে যাওয়া টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিলো জাহাজডুবির প্রায় ৭৩ বছর পর। জাহাজটি পানির তলায় সর্ব প্রথম শনাক্ত হয় ১৯৮৫ সালে। শনাক্ত করেন "উডস হোল ওসানোগ্রাফিক ইন্সটিটিউশন" এর বিজ্ঞানী "রবার্ট বালারড" । টাইটানিকের সেই নিদারুন ধ্বংসাবশেষটিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে , বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন কায়দায় বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তারা এটির দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করেন। টাইটানিক এর ডুবে যাওয়া ধংশাবশেসটিকে পানির উপরে তোলার জন্যে নানাভাবে আলোচনা ও প্রস্তাব করা হয়। এবং আরো সংযোজন করা হয়েছিলো যে কোনোভাবে যদি জাহাজটিকে পানির উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসা যায় ।তাহলে এর বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখে বিশ্বের মানুষ কল্পনা করতে পারবে যে কি অতিকায় ছিল টাইটানিক এবং কত মর্মান্তিক ভাবে ডুবে গিয়েছিলো আটলান্টিকের কালো পানির তলায়।

১৯১২ সালে ডুবে যাওয়া টাইটানিককে তার সমাধীস্থল থেকে পানির উপর উঠিয়ে আনতে অনেক সংস্থা অনেক মতামত দিয়েছিলো। টাইটানিকের সাথে ডুবে যাওয়া প্রভাবশালী ধনীদের মধ্যে গুগেনহাম, জন অ্যাস্টর, উইডেনারস পরিবার টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ উত্থানের জন্যে মেরিন চ্যাপম্যান ডেরিক, ও রেকিং ড্রেজিং কোম্পানির সাথে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। চুক্তি করা প্রকল্পটি শীঘ্রই অযৌক্তিক হিসাবে ত্যাগ করা হয়েছিল কারণ ডুবুরিরা প্রয়োজনীয় গভীরতার একটি উল্লেখযোগ্য ভগ্নাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি, যেখানে চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চি (৪১০ বার) এর উপরে ৬০০০ পাউন্ডেরও বেশি। রেকিং ড্রেজিং কোম্পানিটি টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ এর উপর দিয়ে ডাইনামাইট ফেলে দেওয়ার

কথা বিবেচনা করেছিল, যা ভূপৃষ্ঠে ভেসে উঠবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমুদ্র বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে চূড়ান্ত চাপের ফলে টাইটানিকের স্টিলের পাতগুলি জেলির মতো নরম হয়ে সংকুচিত হয়ে যাবে।পরবর্তী বছরগুলিতে, টাইটানিককে উদ্ধার করার জন্য অসংখ্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, সমস্ত প্রস্তাব ব্যবহারিক এবং প্রযুক্তিগত অসুবিধার জন্যে, পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিধ্বস্ত টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ এর গঠনগত সমস্যা বোঝার কারণ হয়ে পড়েছিল ।

টাইটানিক ডোবার আগে দুটি খন্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং দুটি খণ্ডই আলাদা আলাদা ভাবে ডুবে যায় এবং সমুদ্রের তলদেশে আলাদা আলাদা জায়গায় আছড়ে পড়ে। প্রায় ৪৭০ ফিট লম্বা টাইটানিকের সামনের অংশটি প্রায় ৪৫ ডিগ্রি কোণে সাগরতলায় আছড়ে পড়ে এবং জাহাজটির ফক্সেল এর অংশ মাটি থেকে প্রায় ১ দশমিক ৮ মিটার উচু হয়ে যায়। টাইটানিক এর সামনের অংশ যখন সাগরতলায় আছড়ে পড়ে তখন প্রায় ১ ফিট এটি সামনের দিকে এগিয়ে যায় যার কারনেই ফক্সেল থেকে শুরু করে স্টোরেজ ডেক পর্যন্ত প্রায় মাটির নিচে গেথে যায়। টাইটানিকের ফানেল্গুলি জাহাজটির সাথে নিচে আসে নি। টাইটানিক ডোবার প্রাক্কালে সমস্ত ফানেলগুলি পানির উপরে ভেসে উঠে কেবলমাত্র ফানেলের সাথে সংযুক্ত কেবল তারগুলি টাইটানিকের ধংশাবশেসের সাথে পাওয়া গিয়েছিলো। টাইটানিকের সামনের অংশ ডোবার পরে প্রায় ২০ নট (২৩ মাইল / ৩৭ ঘন্টা) গতি নিয়ে সাগরতলায় আছড়ে পড়ে এবং টাইটানিক জাহাজের নোঙ্গর গুলির গোড়ায় ৬০ ফুট মাটির তলায় গেথে যায়।

১৯৭০ সালে টাইটানিকের নিমজ্জিত অংশের উত্থানের জন্যে কয়েকটা সংস্থা একত্র হয়ে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিলো। যেখানে তারা তাদের ব্যাবস্থাপত্রে উল্লেখ করেছিলো যে টাইটানিককে সমুদ্র সারফেস মানে উপরে নিয়ে আসতে হলে কিছু জিনিস ব্যাবহার করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে ১,৮০,০০০ টন মল্টেন ওয়াক্স বা ভেসেলিন যেগুলো টাইটানিকের ধংশাবশেসের মধ্যে পাম্প করে ঢোকানো হবে এবং আরেকটা প্রস্তাব তারা রেখেছিলেন যে টাইটানিকে পিং পং বল দ্বারা পরিপূর্ণ করলে হয়তোবা টাইটানিক সমুদ্রে ভেসে উঠতে পারে।কিন্তু সমুদ্রবিদদের ধারনায় পিং পং বল টাইটানিকের রেক সাইটে অর্থাৎ ধ্বংসাবশেষ এর কাছে পৌঁছানোর আগেই পানির চাপে ফেটে যেতে পারে। তাই সম্পূর্ণ প্রকল্পটাই ভেস্তে যায়।

টাইটানিকের স্টার্ন সেকশন মানে পেছনের অংশ ৩৫০ ফিট(১১০ মিটার) লম্বা। ডুবে যাবার সময় টাইটানিকের সামনের অংশের চেয়ে পেছনের অংশ সবচেয়ে বেশী ক্ষতির স্বীকার হয়। ডুবতে ডুবতে এর পেছনের অংশের সকল স্টীলের পাত খোলের শরীর থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো। এবং পেছনের অংশ পানির নিচে যেতে যেতে চায়ে ডোবানো বিস্কুটের মতো খুলে খুলে যাচ্ছিলো। এবং এর ভেতরের সকল যন্ত্রাংশ এবং ডেক প্লেট সব ছিটকে ছিটকে আলাদা হয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে টাইটানিক এর পেছন অংশের শরীর থেকে ডবল বটম নামের সংযুক্ত বটম প্লেট আলাদা হয়ে গিয়ে সমুদ্রতলায় মুখ থুবড়ে পড়ে। টাইটানিকের রাডার যেটা দিয়ে টাইটানিকের দিক পরিবর্তন করা হতো সেটা টাইটানিক থেকে প্রায় ৪৫

ডিগ্রি দক্ষিন পূর্ব কোণে পড়ে আছে। এবং টাইটানিক এর পেছনের অংশ সামনের দিক থেকে ৫ ডেক মাটির নিচে গেথে আছে (হিসেব করলে ৪ ডেক ৫০ ফিট বা ১৫ মিটার) ।টাইটানিকের বিশালাকার প্রপেলারগুলো কে ঘোরানোর জন্যে যে রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন ব্যাবহার করা হতো সেগুলো উচ্চতায় এক একটা ১২-১৫ ফিট এর মতো হবে ।মাটিতে আছড়ে পড়ার পর রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিনের ৭ ফিট মাটির তলায় ঢুকে গিয়েছে শুধুমাত্র পতনের চাপে। হিসেব করলে দেখা যায় টাইটানিকের বো সাইড এর চেয়ে স্টার্ন সাইডের ওজন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। তাই এই অংশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমানও বেশি।

২০১০ সালে যখন টাইটানিকের ডুবে যাওয়া ধ্বংসাবশেষের উপর যখন আবার অভিযান চালানো হয় তখন দায়িত্বরত সকল অফিসাররাই একটু হলেও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তবে তাদের অবাক হওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারন ও ছিলো। তারা যখন আটলান্টিকের ওই যায়গায় অভিযান চালাতে গিয়েছিলেন তখন টাইটানিক থেকে কিছু অংশের বিলুপ্তি দেখে তারা হকচকিয়ে যান। টাইটানিকের বয়লার, রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিনের সিলিন্ডার, ওয়াচটাওয়ার বক্স, ডেভিট, ডবল বটম প্লেট, লোড ক্রেন এর মতো অনেক অংশই হারিয়ে যেতে দেখেন তারা। টাইটানিকের কিছু অংশে সন্দেহজনক গর্ত দেখে আসেন তারা। তবে বড় কথা হলো যে টাইটানিক এর স্টিলের পাত ব্যাক্টেরিয়া এর আক্রমনে ক্ষয়ে যাচ্ছে। টাইটানিক এর ভেতর থেকে র‍্যাটিল বা গ্রেন্ডার ফিস নামের এক প্রজাতির মাছ কে তারা দেখতে পান যেটি টাইটানিকের স্টিলের পাতকে একটু একটু করে গ্রাস করে নিচ্ছিলো। এই দৃশ্য দেখে তারা বুঝতে পারেন যে মানব কারনেই হোক আর প্রকৃতিগত কারনেই হোক টাইটানিক সমুদ্রগর্ভ থেকে আস্তে আস্তে নিঃশ্বেস হয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে হয়তোবা আগামী ৫০-৬০ বছরের মধ্যেই টাইটানিক চিরকালে হারিয়ে যাবে সমুদ্রগর্ভ থেকে। এটা জানতে পেরে আমেরিকান সরকার ও ব্রিটিশ মেরিটাইম সোসাইটি টাইটানিক এর ধ্বংসাবশেষকে আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ড হেরিটেইজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করেন । যেন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ এ গিয়ে কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

টাইটানিক ও বর্তমান নৌ দুর্ঘটনা

(TITANIC and New river and sea Disasters)

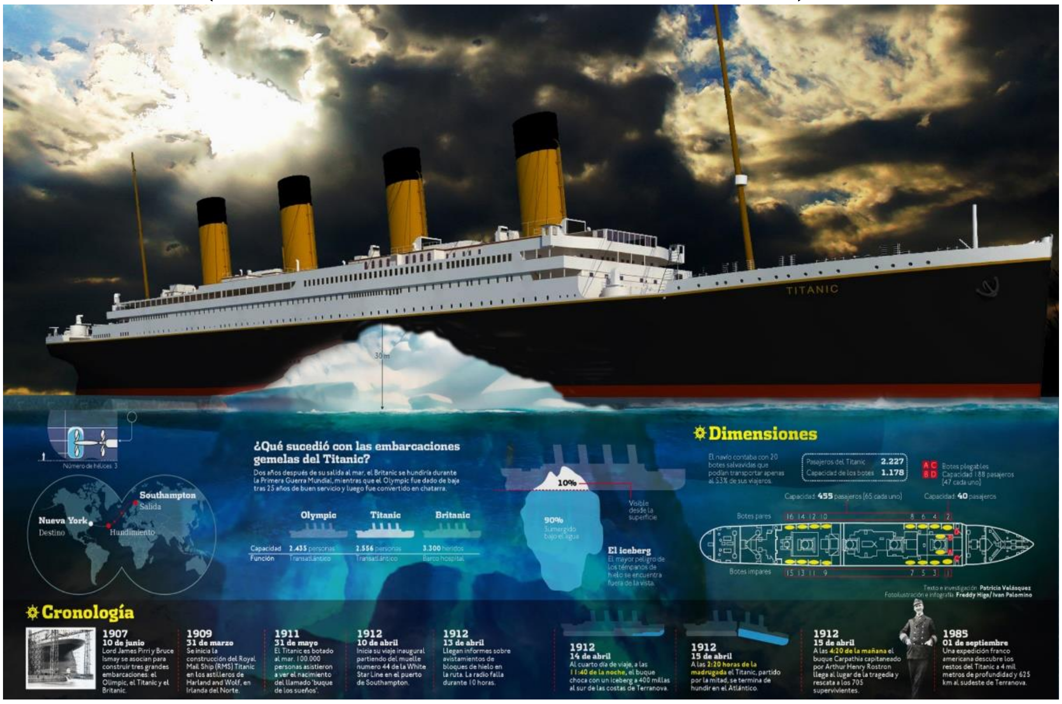

এতক্ষনে হয়তো আমরা সবাই জেনে গিয়েছি টাইটানিক ডুবির সকল কারণ। কেন , কিভাবে , কিসের জন্যে টাইটানিক এর এরকম এক সলীল সমাধী হলো তা আমাদের সকলের কাছে মোটামুটিভাবে পরিস্কার। এই পর্ব টি সাজানো হয়েছে টাইটানিক জাহাজ ও বর্তমান নৌ দুর্ঘটনার সংক্ষেপ কাহীনি নিয়ে। বর্তমানে যে সকল জাহাজ ডুবে গিয়েছে তার মধ্যে থেকে কয়েকটি জাহাজের মর্মান্তিক ডুবির কথা উল্লেখ করছিঃ-

- **ইসতোনিয়া ইন ব্যালটিকঃ** সময় ২০০৬। সে সময়ে আটলান্টিক পাড়ি দেয়া যে সকল যাত্রিবাহী ও মালামালবাহী ফেরী ছিলো তার মধ্যে ইসতোনিয়া ইন ব্যাল্টিক ছিলো সবচেয়ে বড় ফেরী। ধারনক্ষমতা ছিলো ৩৪,০০ যাত্রী ও প্রায় ৬০,০০০ টন । এই জাহাজটি ইস্টলাইন ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানীর সবচেয়ে ব্যাবসাসফল জাহাজ ছিলো। কিন্তু সবচেয়ে ব্যাবসাসফল জাহাজটির ভাগ্যে যে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা লিখা থাকবে তা কে জানত? ২০০৬ সালের ৪ঠা জুলাই ব্যাল্টিক মহাসাগর। সাগরে চলছে জাহাজটি। কিন্তু মহাসাগরের অবস্থা এতটাই খারাপ যে জাহাজ এর স্টাবিলিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্ষনে ক্ষনে। সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ থাকায় অবস্থান সম্পর্কে সন্দিহান ক্যাপ্টেন। অবগত করেছিলেনও রাডার হাউসকে। কিন্তু কোনো রিপ্লাই না পাওয়ায় ওই বিপদজনক পথেই চলছিলো জাহাজটি। এমন সময় জোরালো ঢেউ এর ধাক্কায় খুলে যায় জাহাজের বো হাল হোস্ট ক্যাপ। মুহূর্তেই পানি ঢুকতে থাকে জাহাজটির ভেতর। আর ডুবে যায় ৬৭ মিনিট অর্থাৎ ১ ঘন্টা ৭ মিনিট এর মধ্যে। আর মারা যান ৩২,০০

যাত্রী সহ ৩০০ জন অফিসার। আর সমাপ্তি ঘটে সবচেয়ে ব্যাবসাসফল জাহাজের চলন।

- **<u>কসটা কনকরডিয়াঃ</u>**
  কসটা কনকরডিয়া ছিলো ব্রিটেনের এক নামী কোম্পানি কসটা শিপিং এর অধিনস্ত জাহাজ। ১৩ই জানুয়ারী ২০১২-এ,কোস্টা কনকর্ডিয়া ভূমধ্য সাগরের চারপাশে বিচরনকালে একটি পাথরখন্ডের সাথে ধাক্কা লেগে ডুবে যায়। যখন সে ডুবে যাচ্ছিলো তখন সে তার পরিকল্পিত রুট থেকে বিচ্যুত হয়ে আইসোলা ডেল গিগলিও, টাস্কানি, দ্বীপের কাছাকাছি অবস্থানে ছিলো। জাহাজটি পানির নিচে অসমতল্‌ভাবে ডুবে যায় তার স্টারবোরড সাইডের দিকে কাত হয়ে। । ডুবে যাবার ছয় ঘন্টার পর উদ্ধার প্রচেষ্টায় বেশিরভাগ যাত্রীকে উপকূলে নিয়ে আসা হয় , ৩৩ জন মারা যান । যার মধ্যে ২৭ জন যাত্রী, ০৫জন জাহাজ কর্মী এবং পরে, উদ্ধারকারী দলের একজন সদস্য।

শেষ কথা

(End Speech)

টাইটানিক জাহাজ কে নিয়ে আজও বিজ্ঞানীমহল এর মধ্যে চলছে নানা বিচার, বিশ্লেষণ , গবেষণা এবং আরো অনেক কিছু। প্রতিদিনই টাইটানিক নিয়ে অজানা তথ্যের উন্মোচন ঘটছে ।এবং চেস্টা চলছে আরো তথ্যের উন্মোচন করার যেগুলো আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেছে যেগুলো আমরা জানি না। বিশ্বাস হয় !! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ যেটা কিনা তিন তিনটা ফুটবলের সমান। যেটাকে আনসিঙ্কেবল প্রবাদে ইতিহাসজোড়া খ্যাতি তুলেছিলো ।যেটা কোনোদিনই ডুববে না। সেটা কিনা বরফের আঘাতে সমুদ্রের ১২,০০০ ফিট নিচে ডুবে গিয়েছিলো। এই ছিলো আমার কাছে থাকা টাইটানিক জাহাজ সম্পরকে যাবতীয় তথ্যাবলি। ভবিষ্যতে আরো তথ্যের যোগাড় করে বইয়ের পরিসর বড় করার আশাবাদ ব্যাক্ত করছি। আশা করি সেই পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন।

- বইয়ের সম্পরকে আরো জানতে বা আপনার ব্যাক্তিগত মতামত আমাকে জানাতে ইমেইল করতে পারেন এই ঠিকানায়ঃ

- Nhsiam1434@gmail.com
- Khondker.akik@gmail.com
- Akiktubeofficial@gmail.com

......সমাপ্ত......

আসসালামু আলাইকুম। আমি মুহম্মদ আকিক খোন্দকার। লেখালেখি করাটা আমার সেই ছোট্টবেলার অভ্যাস। আমি ঐতিহাসিক সকল কিছু নিয়ে লিখতে ভালোবাসি। তাই টাইটানিক এর মর্মান্তিক সেই কালোরাত্রের কাহীনি এবং এর সম্পর্কে সকল জানা অজানা তথ্যাবলী আমি সংযোজন করলাম আমার লিখা ছোট্ট এই বইয়ে। আমার এই বই রচনায় যারা যারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাদের প্রতি আমি বিশেষ শ্রদ্ধা জানাই। আর বইটির তথ্যের যোগারে যেসকল বই, পিডিএফ, ওয়েবসাইট আমাকে সাহায্যের কাজ করেছে তাদের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ । আপনারা আরো ঐতিহাসিক কিছু সম্পর্কে তথ্যের কথা জানাতে চাইলে ফেসবুক অথবা টুইটার এ সংযুক্ত হতে পারেন আমার সাথে। আশা করি লিখার জগতে আমার চলার পথের একজন সঙ্গী হবেন।

।**মুহম্মদ আকিক খোন্দকার**।

আমার ফেসবুক এর লিঙ্কঃ Https://www.facbook.com/SANOWER.AKIK

আমার টুইটার এর লিঙ্কঃ Https://www.twitter.com/Akik.Khondker

টাইটানিক অনলাইন ২য় সংস্করনে রয়েছেঃ

এডিটরস রুম পাবলিশিং পোর্টাল , আকিক স্টোরিলাইনস।

বইটি সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোডের জন্যে আপনাকে জানাই সাধুবাদ। বইটি আপগ্রেড করার উদ্দেশ্যে তথ্যের যোগাড়ে ইচ্ছা থাকলে যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে।